



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

সাতের দশকের রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ও নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্প

সুমন্ত মল্লিক¹

স্বাধীনতাব্যবস্থার পশ্চিমবঙ্গের প্রবাহমান রাজনীতির ইতিহাসে সাতের দশক সবচেয়ে উত্তাল তথা অস্থিরময় একটি দশক। সাতের দশকের শুরু থেকেই নকশাল আন্দোলনের তীব্রতা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। তেমনি একই সাথে প্রায় সমগ্র দশক জুড়েই চলেছিল প্রশাসন কর্তৃক নকশাল নিধন যজ্ঞ। এছাড়াও রাজ্যে সময়ের পূর্বেই বারবার সরকার পরিবর্তন, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি, অবৈধভাবে জাল ভোট প্রক্রিয়া, শ্রমিক অসন্তোষের কারণে ধর্মঘট, ছাত্র পরিষদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে রাজ্যজুড়ে বিরোধীদের বন্ধ পালন, জেলের ভেতর কারারক্ষী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ ইত্যাদি বহুবিধ ঘটনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পাশাপাশি দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি, ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির (১৯১৭-১৯৮৪) পরাজয় ও তাঁর পদত্যাগের ঘটনাও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। তাই দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে ১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার ফলে রাজ্য-রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন ও শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালে জেলবন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি, পশ্চিমবঙ্গের বর্গাদের নাম নথিভুক্তিকরণ, ধাপে ধাপে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু, প্রথম ত্রিস্তরীয় পদ্ধতিতে নির্বাচন চালু হয়েছিল। সাতের দশকের পটভূমিতে লেখা বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এই সমস্ত ঘটনাগুলির সক্রিয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যদিও এই দশকের জরুরি অবস্থাকে কেন্দ্র করে লেখা গল্পগুলিকে সরকার সেন্সর করেছিল এবং পরবর্তীতে আবার নতুন লেখা তৈরিও হয়েছিল। তাই নির্বাচিত কয়েকটি ছোটগল্প বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা সাতের দশকের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে খোঁজার চেষ্টা করেছি। মূলত, নকশাল আন্দোলন, জরুরি অবস্থা, বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতা লাভ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা ছোটগল্পগুলিকে মোট চারটি পর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দুই.

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ইতিহাসে নকশাল আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ‘নকশাল’ বলতে সেইসব দলগুলিকে বোঝানো হয়, যারা মতাদর্শের দিক থেকে মাও সে-তুং (১৮৯৩-১৯৭৬)-এর পদাঙ্ক অনুসরণকারী। পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক এলাকা নকশালবাড়ি গ্রামে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল (১৯৬৭ সালের ২৫ মে) মূলত কৃষিজমি সমস্যাকে কেন্দ্র করে এবং ঐ অঞ্চলের জোতদার ও ভূস্বামীদের শোষণ ও শাসনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। চারু মজুমদার (১৯১৮-১৯৭২) ও কানু সান্যালের (১৯৩২-২০১০) নেতৃত্বে ‘নকশাল আন্দোলন’ গড়ে উঠেছিল। আর এই আন্দোলন অচিরেই পশ্চিমবঙ্গসহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্রসারিত হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই নকশাল আন্দোলন সমকালীন সাহিত্যে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিচিত্র স্বাদের ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক ও কবিতা রচিত হয়েছিল। তবে আমরা এই অধ্যায়টিতে নির্বাচিত কয়েকটি ছোটগল্প বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে সাতের দশকের সমাজজীবনে নকশাল আন্দোলন কতটা প্রভাব ফেলেছিল তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করব।

আলোচনার শুরুতেই আমরা অমর মিত্রের (জন্ম- ১৯৫১) ‘ডাইন’ গল্পটির বিশ্লেষণে মননিবেশ করব। গল্পটি সাতের দশকের সূচনালগ্নের পটভূমির আঙ্গিকে রচিত হলেও গল্পটির বিস্তার এই দশকের শেষলগ্ন পর্যন্ত (১৯৭১-১৯৭৯)।

আলোচ্য গল্পটিতে গ্রামবাংলায় খেটে খাওয়া মানুষদের নেতা হয়েছিল হরি নায়েক। সে গ্রামের পূঁজিপতি অর্থাৎ সেই সময়কার তথাকথিত বাবুদের পরিমাণের তুলনায় বেনামে অধিক জমি রাখা ও চড়া হারে সুদ দিয়ে গ্রামবাসীদের ভিটে-মাটি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। তার ভয়ে সন্ত্রস্ত বাবুরা এসব গর্হিত কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। গল্পকার এখানে উহাভাবে হরি নায়েকের চরিত্রে নকশালপন্থী নেতার আদর্শকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এরপর গল্পকার দেখিয়েছেন হরি নায়েকের মৃত্যুর পরও সে কীভাবে গ্রামবাসীদের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল।

আলোচ্য গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই প্রত্যন্ত মেদিনীপুর জেলার গোপীনাথপুর থানার কীর্তিনিয়াশোল মৌজার খেটে খাওয়া মানুষদের নেতা ছিল হরি নায়েক। বাংলায় এই সময় নকশাল আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। তার স্ত্রী ছিল অপরূপ সুন্দরী তবে সে নিজের মতো থাকতো, কম কথা বলতো— তাই গ্রামের অনেকেই তাকে অহংকারী ভাবতো। হরি নায়েক এলাকার বহু প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। তাই সে বাবুদের অত্যন্ত বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু গোপীনাথপুর থানা এলাকার অসহায় দীন-দুঃখী মানুষের আপদে-বিপদে সর্বদা পাশে থাকার কারণে সে ঈশ্বরের অবতার হয়ে উঠেছিল। নকশালপন্থীরাও ঠিক একইরকমভাবে গরিব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতো এবং হরি নায়েকের মতোই নকশালপন্থীরা বিভ্রান্তীদের কাছে গলার কাঁটা হয়েছিল।

গ্রামে শতপথী মহাপাত্রদের মতো মানুষেরা সরকারি নিয়মকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বংশপরম্পরায় বেনামে বহু জমি রাখত, গরিব মানুষদের চড়া সুদে টাকা দিয়ে তাদের জমি ঘর সবকিছু আত্মসাৎ করে আরও ধনবান হয়ে উঠত। আর প্রশাসনও এসবের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিত না কারণ সরকারের ধারণা ছিল এই বাবুরাই দেশের অর্থনীতির ধারক ও বাহক। কিন্তু হরি নায়েকের হস্তক্ষেপের ফলে গ্রামের মানুষেরা বাবুদের দখল

1. গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

DOI Link (Crossref) Prefix: <https://doi.org/10.63431/AIJTR/3.V.2026.1-12>

AIJITR, Volume 3, Issue –V, September - October, 2026, PP.1-12

Received on 1st September, 2026 & Accepted on 11th September, 2026,

Published: 15th September, 2026.

The statement “Copyright © by Author” (The author retains the copyright to the published article.)



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

করা জমিতে চাষাবাদ শুরু করেছিল। গল্পকার তাঁর লেখনী-প্রতিভার বলে এখানে এমনভাবে ঘটনাটিকে পরিবেশন করেছেন, যা সহজেই আমাদের নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থানের ঘটনাটিকে মনে করিয়ে দেয়।

পুলিশ প্রশাসন ছিল হরি নায়েকের বিপক্ষে। প্রচলিত নিয়মকে ভেঙে ফেলা, আইনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য হরি নায়ককে ১৯৭১ সালে জেলে যেতে হয়েছিল। এর ফলে বাবুদের ভয় কেটে গিয়েছিল। তারা পুনরায় জমি দখল ও সুদের হারও বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু হরি নায়ক জেল থেকে মুক্ত হয়ে আসার পর তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পুনরায় এসব কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল—

বাবুরা যমের মত ভয় করেন এই খাঁটি চাষাটিকে।^১

শেষপর্যন্ত গ্রামীণ এলাকার এই কৃষক নেতাটি পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছিল, কিন্তু এই খবর কয়েকজন ছাড়া এলাকার পুলিশ ও বাবুরা এমনকি গ্রামবাসীরাও জানতে পারেনি। যে চারজন নায়কের লাশ নিয়ে গিয়েছিল সুবর্ণরেখা নদীর চরে তারা নায়কের বৌকে শাখা ভাঙার কথা বললে সে গর্জে ওঠে বলে—

শাখা ভাঙলে গাঁসুদু মানুষ মরবে, নায়ক মরলে সকলের মরণ!^২

হরি নায়কের স্ত্রী বোঝাতে চেয়েছিল তার হাতের শাখা ও মাথার সিঁদুরের মধ্য দিয়ে নায়ক চিরকাল এলাকার মানুষের মনের মধ্যে বেঁচে থাকবে তার ফলে বাবুরাও ভয়ে গ্রামের গরিব মানুষদের উপর অত্যাচার ও শোষণ বন্ধ রাখবে। তাই এই খবর গোপন রাখার জন্য শেষপর্যন্ত নায়কের লাশ এ নদী চরেই পুঁতে ফেলা হয়েছিল। এরপর নায়কের স্ত্রীকে সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ হাতে নদী চত্বরে ঘুরে বেড়াতে দেখে গ্রামের লোক ‘ডাইন’ বলে তাকে অপবাদও দেয়। এইভাবে গল্পকার যেমন সাতের দশকের সংগ্রামী কৃষক নেতার চরিত্রটি জীবন্ত করে তুলেছেন তেমনি গ্রাম বাংলার তৎকালীন বাস্তব রূপটিও নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এবারে আমরা গল্পকার তৃপ্ত বর্মনের ‘মুক্তি’ গল্পটি নিয়ে আলোচনা শুরু করব। আলোচ্য গল্পটি সাতের দশকের নকশাল আন্দোলনের আবহে রচিত হলেও গল্পটির সময়সীমার ব্যাপ্তি ১৯৭০ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত। লেখক দেখিয়েছেন পুলিশি পাহারায় হাসপাতালে ভর্তি দ্বৈপায়ন নামের এক ২৪ বছরের নকশালপন্থী যুবকের জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু খণ্ড খণ্ড ঘটনাকে। গল্পটি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই ছোটবেলা থেকেই দ্বৈপায়ন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিল। মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টারমশাই দ্বৈপায়নের কথা বলতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতেন—

শুধু কলেজিয়েট স্কুলের নয়। দ্বৈপায়ন একদিন জেলার গর্ব হয়ে উঠবে।^৩

কিন্তু এই সময় পশ্চিমবঙ্গের স্কুল-কলেজে দেওয়াল লিখন, সাধারণ পুলিশকর্মীদের নির্বিচারে হত্যা, মহাপুরুষদের শিরচ্ছেদ ইত্যাদি ঘটনা জনমানসে নকশালপন্থীদের প্রতি মনোভাব বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছিল এবং ধীরে ধীরে তারা মানুষের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠছিল। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই পার্টিকে ‘নিষিদ্ধ’ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে প্রশাসন নকশাল নিধনে অতিসক্রিয় হয়ে উঠেছিল।

এসব ঘটনা দ্বৈপায়নের মনকে বিচলিত করে তুলতো তাই সে তার বন্ধু তথাগতকে জিজ্ঞাসা করেছিল কীতুহলী মনোভাব নিয়ে—

শ্রেণী শত্রু কাদের বলে রে? পতিক্রিয়াশীল আসলে কারা? পুলিশ মেরে, মূর্তি ভেঙে শোষণবাদ কীভাবে দূর হবে? পার্টির নেতার কে?^৪

এইভাবে একদিন সমাজের আমূল পরিবর্তনের জন্য ‘বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস’^৫ এই ভাবনাকে ধারণ করে পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার তরতাজা ছেলেদের মতো দ্বৈপায়নও নকশাল আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। তার বাবা মধু দত্ত এই খবর জানতে পেরে ছেলেকে নকশালপন্থী ভাবধারা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য শাসন করলে দ্বৈপায়নও স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দিয়ে বলেছিল—

পাঁচ বছর আগেও তুমি কেরাণিটোলার একটা বাড়ীতে একশো টাকার ভাড়াটে ছিলে। আজ বার্জটাউনের মতো জায়গায় চারকাঠা জমির ওপর তোমার দোতলা বাড়ি। এটা যে সোজা পথে হয়নি, তা তুমি নিজেও জানো। বুকে একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের ব্যাজ লাগিয়ে, দেশের হাজার হাজার নিরন্ন মানুষকে বঞ্চিত করে যারা ‘স্বাধীনতা’ নামের সোনার পাথরবাটিটা দু-হাতে চাটছে—তুমিও তো তাদেরই একজন।^৬

এই ঘটনার চার বছর পর অর্থাৎ জরুরি অবস্থা চলাকালীন উত্তরবঙ্গের এক চা বাগানে পুলিশের সাথে শসস্ত্র সংগ্রামে দ্বৈপায়ন গুরুতরভাবে আহত হয়ে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। প্রশাসনের নজরদারিতে সে হাসপাতালে ভর্তি ছিল, সেখানে মিনতি নামের সিস্টার দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে তাকে খুব স্নেহও করত। তার কারণ মিনতির আঠার বছর বয়সী ভাই মৃদুলকে পুলিশ এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে হত্যা করেছিল। এরপর ‘পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সালের ২১ জুন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেই মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকেই সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির আদেশ দিয়েছিল।’^৭ এদের মধ্যে দ্বৈপায়নও ছিল একজন। তাই মিনতি যখন তার মুক্তির খবর শোনাতে এসেছিল তখন দ্বৈপায়ন খুশি হবার পরিবর্তে নিজের মনের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব সংকটের কথা ভেবেছিল—

কাল সকাল হলে এই হাসপাতাল চত্বরের বাইরে যে পৃথিবীটা তার মুক্তির জন্য অপেক্ষা করে আছে, সেখানে তার জায়গা কোথায়? চব্বিশ বছরের এই পঙ্গু, আশক্ত শরীরটা ব্যস্ত জগতের কার কোন কাজে লাগবে? মেদিনীপুরে বাবার কাছে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। খোঁজাখুঁজি করলে দলের পুরনো দু-চারজনের দেখা হয়তো পাওয়া যায়। কিন্তু না। ব্যর্থ দ্বৈপায়নের হাতের কাছে আঁকড়ে ধরার কিছুই নেই। একমাত্র সিস্টার মিনতির উপহার দেওয়া বেতের লাঠিটা ছাড়া।^৮

আলোচ্য গল্পে গল্পকার ফুটিয়ে তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গে সাতের দশকের শুরু থেকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত হাজার হাজার নকশাল নেতা-কর্মীদের উপর পুলিশের নারকীয় অত্যাচারের বীভৎস ছবিকে। আমরা জানি, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে তাদের মুক্তি দিলেও সমাজে আর পাঁচজন সাধারণ সাধারণ মানুষের মতো সহজ-সরলভাবে জীবনধারণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সমালোচক অরূপকুমার দাসের ভাষায়—

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর রাজবন্দী মুক্তির সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পূর্ববর্তী ছ-সাত বছরের বন্দীত্ব এদের অনেককেই জীবনের স্বভাব সংস্থান থেকে বিচ্যুত করে দেয়। ... ‘মুক্তি’ গল্পের দ্বৈপায়নের পরিণতিও তেমনই।^৯

এইভাবে দ্বৈপায়নের সাতের দশকের শুরুর দিকে নকশাল আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পুলিশের সাথে শসস্ত্র সংগ্রামে আহত তথা পঙ্গু হয়ে যাওয়া, সমগ্র জরুরি অবস্থা [১৯৭৫-১৯৭৭] জুড়ে পুলিশি পাহারায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা এবং শেষ পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় এলে সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তিপ্রদানের মতো তাকেও মুক্ত করে দেওয়ার ঘটনা এই গল্পে বর্ণিত হয়েছে। গল্পকার এখানে দ্বৈপায়নের জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের বাস্তবতার দিকটিকে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট ছোটগল্পকার মহাশ্বেতা দেবীর (১৯২৬-২০১৬) তাঁর ‘দ্রৌপদী’ গল্পটির মাধ্যমে সাতের দশকের প্রথম দিকের অস্থির সময়ের ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। গল্পটি অগ্নিগর্ভ (১৯৭৮) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত হলেও পরিচয় পত্রিকায় ১৯৭৭ প্রথম সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

আলোচ্য গল্পটিতে মহাজন, জোতদার, গোলদাররা সমাজের আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা অসহায় মানুষদের প্রতিনিয়ত শোষণ ও অত্যাচার করেছে, আর এই শোষণ, অত্যাচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে কিছু মানুষ সশস্ত্রভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে এবং শোষণকারীদের ‘খতম’ (হত্যা) করেছে। অন্যদিকে মহাজন জোতদারদের বাঁচাতে ও নকশাল নিধনের জন্য সরকার কর্তৃক পুলিশ ও আর্মি মোতায়েন করা হয়েছিল। আলোচ্য ছোটগল্পটিতে নৃশংস পুলিশের অত্যাচারের ছবি লেখিকা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

‘দ্রৌপদী’ গল্পে দ্রৌপদী মেঝে নামটি আমাদের বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার স্বামী দুর্লব মাঝিকে পুলিশ নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করেছিল। দ্রৌপদী মেঝেও পুলিশের গুলি খেয়েছে, তাই তার কাঁধে ক্ষতচিহ্ন রয়ে গেছে তাও সে একটুও দমেনি। এমনই অদম্য সাহসী এই আদিবাসী মহিলাকে পুলিশ চিরুণী তল্লাসির মাধ্যমে প্রতিনিয়ত খুঁজে চলেছে। এমনকি প্রশাসনের তরফ থেকে তাকে জীবিত বা মৃত সন্ধান দিতে পারলে পুরস্কারের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। তার কারণ—

দুর্লব ও দ্রৌপদী দাওয়ালি কাজ করত, বিটুইন বীরভূম-বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ-বাঁকুড়া রোটেট করে ঘুরত। উনিশশো একাত্তর সালে বিখ্যাত অপারেশন বাকুলিতে যখন তিনটি গ্রাম হেভি কার্ডন করে মেশিনগান করা হয় তখন এরা দুজনও নিহতর ভান করে পড়ে থাকে। বস্তুত এরাই মেন ক্রিমিনাল। সূর্য সাহ তর ছেলেকে খুন, ড্রাইটের সময়ে আপার কাস্টের ইদারা ও টিউবওয়েল দখল, সবচেয়েই এরা মেন।^{১০}

ছোটবেলা থেকেই বন-জঙ্গলের সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়ার কারণে দ্রৌপদী, তার স্বামী ও তাদের অন্যান্য সঙ্গী-সাথীদের পুলিশ সহজে ধরতে পারে না। তাই তারা বাকুলি থেকে পালতাকুড়ি ও তারপর ঝাড়খানীর জঙ্গলে গা ঢাকা দিতে পেরেছিল। অপরদিকে প্রশাসনও সাধ্যমতো তাদের নিকেশ করার কাজে ব্রতী হয়েছিল—

যা হোক, এরপর জানা যায় বহু যুবক-যুবতী ব্যাচ বাই ব্যাচ জিপগাড়ি আরোহণে থানার পর থানা হানা দিয়ে অঞ্চলটিকে যুগপৎ সম্ভ্রান্ত ও উল্লসিত করে ঝাড়খানীর জঙ্গলে বিলীন হয়। যেহুতু বাকুলি থেকে নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে দ্রৌপদী ও দুর্লব প্রায় সকল জোতদার ঘরে কাজ করেছে, সেহুতু তারা হস্তব্যদের বিষয়ে হস্তাদেরকে টপাটপ খবর দেয় এবং সগর্বে ঘোষণা করে তারাও সেনানী, র‍্যাংক অ্যান্ড ফাইন। অবশেষে দুর্ভেদ্য ঝাড়খানী জঙ্গল সেনানী দিয়ে চক্রবুহ বেড়ে ফেলা হয়, আর্মি ভেতরে ঢোকে ও বনভূমি চিরে চিরে পলাতকদের খোঁজে। একই সঙ্গে কার্টোগ্রাফার বনের ম্যাপ আঁকতে থাকেন ও সেনারা জলপানের অবলম্বন ঝর্ণা ও কুণ্ডীগুলি পাহারা দেয় আড়াল থেকে, আজও দিচ্ছে, আজও খুঁজছে। তেমনি এক তল্লাসকালে সেনাদের খোঁজিয়াল দুখিরাম ঘড়ারী দেখতে প্রায় চ্যাটাল পাথরে উপুড় হয়ে শুয়ে এক সাঁওতাল যুবক মুখ ডুবিয়ে জল খাচ্ছে। সে অবস্থায় তাকে গুলিবিদ্ধ করা হয় ও ৩০৩-র আঘাতে ছটকে পড়ে যেতে যেতে সে দু-হাত ছড়িয়ে ভীষণ গর্জনে ‘মা-হো’ বলে সফেন রক্ত উদ্গিরণ করে নিশ্চল হয়। পরে বোঝা যায় সে-ই কুখ্যাত দুর্লব মাঝি।^{১১}

স্বামীর মৃত্যুর পরও দ্রৌপদী থেমে থাকেনি, সে তার সদলবলে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে অন্যদিকে সেনারাও দ্রৌপদীর খোঁজ পাওয়ার জন্য নানারকম পরিকল্পনা করতে থাকে। আসলে দ্রৌপদী, তার স্বামী ও এদের সঙ্গীসাথীরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে চেয়েছিল। সেই কারণে তারা গোলাদার, জোতদার, মহাজন ও পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল।

সাতের দশকে নকশালপন্থীদের পুলিশ ধরতে পারলে নারী-পুরুষ নির্বিচারে তাদের ওপর যেভাবে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাত আলোচ্য ছোটগল্পটিতে লেখিকা সেই ছবি জীবন্তরূপে তুলে ধরেছেন। তাই যখন দ্রৌপদীকে পুলিশ ক্যাম্পে ধরে এনেছিল তখন তার সঙ্গীসাথীদের নাম, তাদের আস্তানা ইত্যাদি জানার জন্য তাকে এক ঘণ্টা ধরে জেরা করা হয়, কিন্তু তাদের কাছ থেকে সেনানায়ক সদুত্তর না পেলে বলে— ‘ওকে বানিয়ে নিয়ে এস। ডু দি নিডফুল’^{১২} তারপর শুরু হয় শারীরিক অত্যাচারের পালা। কিছু সময় কেটে যাওয়ার পর অচৈতন্য হয়ে যায় দ্রৌপদী, তারপর যখন সে চোখ খোলে তখন তার অবস্থার কথা লেখক বর্ণনা করেছেন নির্মোহ দৃষ্টিতে—

ক্রমে ওর মস্তিষ্ক থেকে রক্তাভ আলাপিনের মাথা সরে যায়। নড়তে গিয়ে ও বোঝে এখন ওর দু-হাত দু খুঁটোয় এ দু-পা দু খুঁটোয় বাঁধা। পাছা ও কোমরের নিচে চটচটে কী যেন। ওরই রক্ত। শুধু মুখের ভেতর কাপড় নেই। ভীষণ তেপ্তা। পাছে জল বলে ওঠে, সে ভয়ে দাঁতে নিচের ঠোঁট চাপে। বুঝতে পারে যোনিদ্বারে রক্তস্রাব। কতজন ওকে বানিয়ে নিতে এসেছিল? ওকে লজ্জা দিয়ে চোখের কোল থেকে জল গড়ায়। ঘোলাটে চাঁদের আলোয় বিবর্ণ চোখ নীচের দিকে নামতে নিজের স্তন দুটি চোখে পড়ে এবং ও বোঝে— হ্যা, ওকে ঠিকমতো বানানো হয়েছে। এবার ওকে সেনানায়কের পছন্দ হবে। স্তন দুটি কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত, বৃন্ত ছিন্নভিন্ন। কত জন? চার-পাঁচ-ছয়-সাত তারপর দ্রৌপদীর হৃদয় ছিল না। পাশে চোখ ফিরিয়ে ও সাদা কী যেন দেখে। ওরই কাপড়। আর কিছু দেখে না। সহসা দেবকৃপা আশা করে ও। সম্ভবত ওকে ফেলে গেছে ওরা। শোয়ালে ছিঁড়ে খাবে বলে। কিন্তু ওর কানে আসে পায়ের ঘষাটানি। ঘাড় ঘোরায় ও, বেয়ানেটে ভর দিয়ে দাঁড়ানো সান্ত্বিত ওকে দেখে হাসে। চোখ বোজে দ্রৌপদী। আক্ষেপ করতে হয় না বেশিক্ষণ। আবার বানিয়ে নেওয়ার পক্রিয়া শুরু হয়। চলতে থাকে। চাঁদ কিছু জ্যোৎস্না বমি করে ঘুমোতে যায়। থাকে শুধু অন্ধকার। একটি বাধ্য হয়ে পা ফাঁক করে চিত্তিয়ে থাকা নিশ্চল দেহ। তার ওপর সক্রিয় মাংসের পিস্টন ওঠে ও নামে, ওঠে ও নামে।^{১৩}

দ্রৌপদীর ওপর রাতভর নির্মম শারীরিক অত্যাচার যেন মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায়। সাতের দশকে নকশালপন্থী মহিলাদের পুলিশ গ্রহণতার করে থানায় নিয়ে গিয়ে কীরূপ পাশবিক অত্যাচার চালাতো নিম্নে তার আর একটি নিদর্শন তুলে ধরা হল। ১৯৭৪ সালে দ্রব্যমূল্য বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মহিলাকর্মীদের মুক্তির পরে সংবাদপত্রে তাদের প্রদত্ত বিবৃতি থেকে জানা যায়—

গ্রেফতারের পর নকশালপন্থী সন্দেহে ধৃত এই যুবতীদের এক দফা জিজ্ঞাসাবাদের পর জেলে প্রেরণ করা হয়। প্রায়শই জেরার সময় শারীরিক অত্যাচারও হয়েছে। একমাস জেল হাজতে কাটাবার পর যুবতীদের অধিকাংশকে লাল বাজারে নিয়ে শুরু হত শারীরিক নির্যতন। এই যুবতীদের উলঙ্গ করে চিং করে টেবিলের ওপর রাখা হয়। তারপর তাদের ঘাড়ে, স্তনে, পেটে এবং অন্যান্য কোমল গুপ্ত স্থানে জ্বলন্ত সিগারেট দ্বারা ছেঁকা দেওয়া হয়। এর পরেও যাঁরা সংবাদ দিতে অস্বীকার করতেন তাদের গুহে লোহার ডাঙা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। (বারবার এরকম অত্যাচারের ফলে কারো কারো গুহা দ্বারা যোনির সঙ্গে মিশে যায়) এরপর আবার জেলে এবং ২০/২২ দিন পরে পুনরায় একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি।^{১৪}

তৎকালীন সময়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়া নকশালপন্থীদের নারকীয় অত্যাচার সহ্য করতে হতো। আমাদের আলোচ্য ‘দ্রৌপদী’ ছোটগল্পের মুখ্য চরিত্র



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

দ্রৌপদীও এই অত্যাচার সহ্য করেছে, কিন্তু তাও সে এতটুকুও দমে যায়নি। তাই অত্যাচারের পর নিজের কাপড় দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেয় এবং উলঙ্গ অবস্থাতেই বড় সাহেবের খুব কাছে চলে যায়, তারপর—

কোমরে হাত রেখে দাঁড়ায়, হাসে ও বলে, তুর সাঁধানের মানুষ, দোপদী মেবেন। বানিয়ে আনতে বল্যেছিলি, তা কেমন বানিয়েছে দেখবি না? ^{১৫}

বীরাজনা দ্রৌপদীর এরূপ আচরণে বড়সাহেবও ভয় পেয়ে যান। আসলে সমাজের অত্যাচারিত ও জুলুমবাজ কিছু মুষ্টিমেয় মানুষের কারণে দ্রৌপদী তার স্বামীকে নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে না পারলেও সে চেয়েছিল তাদের এই সংগ্রামের ফলে একদিন সমগ্র বাংলায় সব অত্যাচারের অবসান ঘটবে এবং সমাজের সমস্ত মানুষ সুখে-শান্তিতে তাদের জীবন অতিবাহিত করতে পারবে।

একালের বিখ্যাত ছোটগল্পকার গুণময় মল্লার (১৯২৫-২০১০) ‘সাক্ষী’ গল্পটিতে সাতের দশকে নকশালপন্থীদের ওপর পুলিশের সন্দেহ, গ্রেপ্তার ও অমানবিক নির্মম অত্যাচারের ছবি ফুটে উঠেছে। গল্পকার এখানে সমাজে ঘটে যাওয়া নকশালপন্থী ও পুলিশের একাধিক কার্যকলাপের মতো ঘটনাগুলিকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে উপস্থাপন করেছেন।

আলোচ্য ছোটগল্পটিতে আমরা দেখতে পাই পুলিশের নির্মম অত্যাচারের সাক্ষী থেকেছে ১১-১২ বছরের একটি জিজ্ঞাসু কিশোর। বুড়ো নামের এই ছেলেটি লক্ষ্য করেছে পাড়ায় পাড়ায় কীভাবে পুলিশ ধড়পাকড় চালিয়ে নকশালপন্থী যুবকদের তুলে নিয়ে গেছে। গল্পে দেখা যায়, পুলিশ সুজয়ের মতো সশস্ত্র নকশালপন্থী যুবককে গ্রেফতার করতে এলে সে আত্মরক্ষার তাগিদে পুলিশের উপর গুলি, বোমা নিক্ষেপ করে, ফলে তারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে নাইট সেকসেনে পড়া কমান্সের ছাত্র অতীক বসু রায়কে পুলিশ পিছু পাড়ার উত্তরদিকে একটি মার্ভার কেসের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করার নাম করে থানায় নিয়ে যাবার সময় বি. টি রোডে জনবহুল গর্জনময় পরিবেশে নাটকীয়ভাবে পুলিশ ভ্যানের ভিতরেই গুলি করে নৃশংস ভাবে হত্যা করেছিল। আসলে সাতের দশকে নকশাল নিধনের জন্য পুলিশকে সরকার সমস্ত রকমের ক্ষমতা দিয়েছিল। তাই গোটা দশক জুড়েই পুলিশ নকশালপন্থীদের শিক্ষা দেবার জন্য সুযোগ পেলেই এনকাউন্টার করে হত্যা করতো। ‘সাক্ষী’ গল্পটিতেও নকশালপন্থীদের দমন করার উদ্দেশ্যে পুলিশের অতিসক্রিয়তার দিকটিকে লেখক তুলে ধরেছেন।

প্রখ্যাত গল্পকার কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (জন্ম- ১৯২৩) ‘প্রতিক্রিয়া’ গল্পটি সাতের দশকের রাজনৈতিক পটভূমিকায় লেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ ছোটগল্প। এই ছোটগল্পটির ঘটনাক্রমের বিস্তারকাল সাতের দশকের শুরুর দিকে হলেও তা জরুরি অবস্থা পেরিয়ে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসা এবং এই সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ অর্থাৎ সাতের দশকের প্রায় শেষ পর্যন্ত এই গল্পটির বিস্তার। গল্পটিতে নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে দীপেন নিজের পরিবারে আর্থিক অসহায়তা ও কঠোর বাস্তবতা থেকে শিক্ষা নিয়ে হাজার হাজার পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে নকশাল আন্দোলনে যোগদান এবং শত্রুদের সাথে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিল। তার জীবনসংগ্রামের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সাতের দশকের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা উঠে এসেছে।

আলোচ্য ছোটগল্পটির কথক তথা কেন্দ্রীয় চরিত্র দীপেন, তার বাবা মারা যাবার পর সংসার চালানোর সমস্ত দায়িত্বভার তার ঘাড়ে এসে পড়ে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও যখন সে নিজের জন্য কোনো কাজ খুঁজে পেল না তখন তারই কলেজের অর্থবান বন্ধু অধীশের আগ্রহে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে ধরণীদার নেতৃত্বে দীপেন নকশাল আন্দোলনে যোগ দেয়। একদিন অধীশের মা তাদের গোপন আস্তানায় গিয়ে ছেলেকে এই রাস্তা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য শত মিনতি করলেও অধীশ তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাই তার মা পুলিশের সাথে কথা বলে তাদের গোপন আস্তানার খবর জানিয়ে দেয়। এর পরিবর্তে পুলিশ অধীশকে ছেড়ে দেয় এবং তার বাবা তাকে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু বাকী সবাইকে পুলিশ বন্দী করেছিল। তবে পুলিশ কেবলমাত্র নকশালপন্থীদের গ্রেফতার করেই ক্ষান্ত হয়নি, জেলের মধ্যে তাদের ওপর ব্যাপক শারীরিক অত্যাচারও চালিয়েছিল। আর দেশে জরুরি অবস্থা জারি (১৯৭৫-এর ২৬ জুন) হবার পর এই অত্যাচারের মাত্রা আরও বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। যার ফলে বহু নকশালপন্থী যুবক পঙ্গু পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল যাদের মধ্যে দীপেনও একজন। আলোচ্য ছোটগল্পটিতে লেখক অসাধারণ দক্ষতায় নকশালপন্থীদের সাথে পুলিশের সশস্ত্র সংগ্রাম এবং জেলের ভেতর পুলিশি অত্যাচারের ছবিটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন দীপেন ও নকশাল নেতা ধরণীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে—

সেদিন অসংখ্য রাইফেলধারী আমাদের ঘিরে ফেলেছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম শেষ লড়াইটা করব। ভাবনাটা মনেই থেকে গেল। গোটা কয়েক বোমা আর কয়েকটা রিভলভার, অজস্র রাইফেলের কাছে খেলনা মাত্র। পালিয়ে যাওয়ারও উপায় ছিল না। আমাদের মধ্যে দু-একজন অসম্ভব ক্রোধে পাগলের মতো হয়ে উঠেছিল। ফলে বোমার শব্দে মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠেছিল এলাকাটা। তারপরেই উকুনবাছার মতো আমাদের তুলে নেওয়া হল। ধরণীদা, এখন আমার ডান হাতটা প্রায় নুলো। চোয়ালটা বঁকে একদিকে কত হয়ে আছে। আমার শরীরের ভিতরটা কমজোরি। ^{১৬}

এরপর ১৯৭৭ সালে দেশে এবং রাজ্যে উভয়ক্ষেত্রেই সরকারের পালাবদল ঘটেছিল। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সালের ২১ জুন জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেই কয়েক দিনের মধ্যেই প্রথম মন্ত্রীসভার বৈঠকে সিদ্ধান্তানুযায়ী সমস্ত রাজবন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। গল্পের কথক দীপেনও মুক্তি পায়। এরপর ঘরে ফিরে সে দেখে সংসারের অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ হয়েছে। তাই দারিদ্রের শেকল থেকে পরিবারকে মুক্ত করার আশায় আগের মতোই কাজের সন্ধানে চারিদিকে হনো হয়ে ঘুরতে থাকে। কিন্তু সব জায়গা থেকেই তাকে হতাশ হয়ে ফিরতে হয়। এরকম অবস্থায় একদিন হঠাৎ করে ফুটপাথে হাঁটার সময় অধীশের সাথে দেখা হয়েছিল। তার আজকের এই অবস্থার কারণ অধীশ— একথা ভেবে যখন তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে অফিসে পৌঁছালে অধীশ তার হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেয়। শেষ পর্যন্ত পরিবারের দারিদ্রতার কথা ভেবে দীপেন চাকরির নিয়োগপত্র হাতে নিয়েছিল। পরে তার ভাইও অধীশের ফ্যাক্টরিতে চাকরি পায়। তাই দীপেন সেই ঘটনা মনে করে নকশাল নেতা ধরণীদের বলে—

বিশ্বাস করুন, কোমরের কাছে রাখা অস্ত্রটার কথা আমার যে একেবারে মনে ছিল না তা নয়, কিন্তু একটা চাকরি পেয়ে আমার মা-ভাইবোন এদের মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। সেই মুখগুলোতে একটু হাসি ফুটুক এই চাওয়াটাই আমার কাছে বড়ো হয়ে উঠেছিল তখন। একথা অস্বীকার করবার কোনও কারণ নেই। ^{১৭}

গল্পকার এখানে সাতের দশকের পটভূমিতে দীপেনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের হাজার যুবকের সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে নকশাল আন্দোলনে যোগ দেওয়া, পুলিশের সাথে নকশালপন্থীদের সশস্ত্র সংগ্রাম, প্রথম শ্রেণির নকশাল নেতাদের দায়িত্বহীনতা ও স্বার্থপরতা, জেলের মধ্যে জরুরি অবস্থা চলাকালীন প্রচণ্ড পুলিশি অত্যাচার, সরকারের পালাবদল এবং তাদের সিদ্ধান্তের কারণে নকশালপন্থীদের মুক্তি, জেল থেকে বেরিয়ে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িতে সমাজের চোখে এই দাগী সংগ্রামী মানুষগুলির বেঁচে থাকার জন্য জীবনসংগ্রামের কথা আলোচ্য ছোটগল্পটিতে তুলে ধরেছেন।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের (জন্ম- ১৯৪৪) ‘পাতক’ ছোটগল্পটিতে সাতের দশকের পশ্চিমবঙ্গে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক ঘটনার বিস্তৃত আলোচনা



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

না থাকলেও লেখক স্বল্পপরিসরে হলেও রাজ্য-রাজনীতির কথা তুলে ধরেছেন। লেখক জানিয়েছেন সাতের দশকে রাজনীতির প্রভাব এই প্রান্তিক গ্রামটিতে সেভাবে পড়েনি। কিন্তু দেশীয় রাজনীতি নিয়ে এই গ্রামের মানুষদের মধ্যে আলোচনা ও তাদের মনোভাবের আদান-প্রদান লক্ষ্য করা যায়। গল্পকারের ভাষায়—

আছে হাতুড়ে, বদ্যি নাপিত, প্রাইমারি স্কুল, মুদি ও চায়ের দোকান— যেখানে সন্ধ্যায় মিটমিটে হ্যারিকেনের অনুজ্জ্বল আলোয় গ্রামীণ কৈন্দল থেকে দেশীয় রাজনীতির আদান-প্রদান হয়।^{১৮}

এই গল্পে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা বলতে যেটি ঘটেছিল সেটি হল— এই গ্রামে হুঁটভাটা খোলায় হিন্দুস্থানি মালিক বিরজলালকে অজ্ঞাত কিছু লোক রাতের অন্ধকারে ভোজালির কোপ মেরে গুরুতর আহত করেছিল। পুলিশের খাতায় ঘটনাটি নকশালি হামলা বলে রেকর্ড করা হয়েছিল। এই ঘটনাতে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন সেসময় সশস্ত্র নকশাল আন্দোলনে রাজ্যের প্রায় সমস্ত প্রান্তিক গ্রামগুলিতে কম-বেশি প্রভাব ফেলেছিল তা গল্পটির বর্ণনাতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তিন.
ভারতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাসে জরুরি অবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভারতবর্ষের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি এলাহাবাদ হাইকোর্টে রাজনারায়ণ (১৯১৭-১৯৮৬) কৃত মামলায় নির্বাচনের দুর্নীতির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। এরপর সুপ্রিম কোর্টও রায় দিয়েছিল— ইন্দিরা গান্ধি লোকসভার সদস্য থাকতে পারবেন না কিন্তু প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারেন। এরপর দেশের সমস্ত বিরোধী দলের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তুলেছিল। এই অবস্থায় ইন্দিরা গান্ধি ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ও একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন জরুরি অবস্থার ঘোষণা পত্রে রাষ্ট্রপতিকে স্বাক্ষর করিয়ে গভীর রাতেই সারা দেশে ‘জরুরি অবস্থা’ জারি করার কথা ঘোষণা করেছিলেন।^{১৯}

এই জরুরি অবস্থাকে কেন্দ্র করে ‘মিসা’ আইন প্রয়োগ করা হয়েছিল। যেখানে কোনো কারণ না দেখিয়েই যাকে খুশি প্রশাসন গ্রেফতার করতে পারত এবং সেন্সর গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছিল— যার ফলে কোনো কিছুই সরকারের বিরুদ্ধে লেখা বা প্রকাশ করা যেত না। কিন্তু এরূপ ভয়ংকর পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করেও সাহিত্যিকরা সাহিত্য রচনা করেছিলেন। মূলত, ‘জরুরি অবস্থা’-র এই দমবন্ধকর পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে লেখা ছোটগল্পগুলিকে নিয়ে আলোচনাই আমাদের প্রস্তাবনা।

সাতের দশকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক জরুরি অবস্থা জারি ও সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে একালের স্বনামধন্য বিশিষ্ট ছোটগল্পকার অরুণরতন বসু (১৯৩৯-২০০৫) ‘গুটেনবার্গ সমস্যা’ ও ‘আর্কিমিডিসের লাঠি’ নামে দুটি ছোটগল্প লিখেছিলেন। আলোচ্য ছোটগল্পগুলি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা সাতের দশকের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতকে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

প্রথমে আমরা অর্ঘব সাহা সম্পাদিত ছোটগল্পকার অরুণরতন বসু (১৯৩৯-২০০৫)-র *অন্তরীপ ও অন্যান্য* (উপন্যাসের ও ছোটগল্পের সংকলন) সংকলনের অন্তর্গত ‘গুটেনবার্গ সমস্যা’ ছোটগল্পটিকে নিয়ে আলোচনা করব।

আলোচ্য গল্পটির পরিসর মূলত সাতের দশকে জরুরি অবস্থা চলাকালীন প্রশাসন কর্তৃক সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করা, যথেষ্ট দুর্নীতি ও ব্যাপক পুলিশি দমন-পীড়ন। ছোটগল্পটির শুরুই হয়েছে জরুরি অবস্থা জারির প্রথম দিনকে [১৯৭৫ সালের ২৬ জুন] কেন্দ্র করে। লেখকের ভাষায়—

সেদিন ভোরবেলায় ভারি বুটের কুচকাওয়াজের আওয়াজে চন্দ্রোদয়ের ঘুম ভাঙল। নীচের রাস্তা থেকে আওয়াজটা আসছে। মিলিটারি কায়দায় একটা কটু চিংকার আর তারপর রাইফেলের কুঁদো ও নালবাঁধানো বুটজুতোর ঠোকাঠুকি হওয়ার গভীর শব্দ। কুয়াশার রাস্তায় হঠাৎ ট্রাফিকের আলো দেখে থমকে দাঁড়ানো গাড়ির মতো চন্দ্রোদয়ের ঘুমন্ত মাথা একবার জেগে উঠল; তার মনে পড়ল কাল সারা দেশে জরুরি আইন জারি হয়েছে। এই জন্যই এত কুচকাওয়াজ। ঘুম জড়িত চোখে সে উঠে জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে দেখল ফুটপাথে কালো সামরিক বুটের সার। ঠিক তখনই বারান্দায় ঝপ করে কিছু একটা পড়ার শব্দ হওয়ায় চমকে উঠল চন্দ্রোদয়, তারপরই মনে পড়ল, আরে এ তো সে রোজই শোনে। নীচ থেকে প্রত্যেকদিন খবরের কাগজ ছুঁড়ে দেয় হকার, এ-তারই শব্দ। বারান্দার দরজটা আলগোছে খুলতেই চন্দ্রোদয়ের চোখে পড়ল দূরে কুয়াশায় অস্পষ্ট একটা ট্যাঙ্ক; তাড়াতাড়ি মাটি থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে সে দরজা বন্ধ করে দিল। এত চটপট রাস্তায় সাজোয়াবাহিনী ও ট্যাঙ্ক নেমে পড়বে তা কাল রাতে ঘুনাঙ্করেও টের পাওয়া যায় নি।^{২০}

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির পরামর্শে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ফলে সাধারণ জন্মানসে যে প্রভাব পড়েছিল আলোচ্য গল্পে গল্পকার তার বাস্তব রূপকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। কার্যত ইন্দিরা গান্ধি নিজের ক্ষমতা কায়ম রাখার জন্য সংবিধানের একাধিক আইনের আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন— তার মধ্যে অন্যতম হল ‘মিসা’ (‘Maintenance of Internal Security Act’)— এই আইন বলে যে কোনো ব্যক্তিকে সরকার বা প্রশাসন চাইলেই কোনো কারণ ছাড়াই গ্রেফতার করতে পারত। এমনকি নিজে নিজে প্রমাণ করার জন্য আদালতে যাওয়ার পর্যন্ত তার কোনো অধিকার ছিল না। এগুলির পাশাপাশি দেশবাসীর আরও যে সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল সেগুলি হল—

ক) শিল্প-সংস্কৃতির কণ্ঠরোধ

খ) প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ : নির্বিচারে গ্রেফতার ও ব্যাপক অত্যাচার

গ) সংবিধান এবং বিচার ব্যবস্থার অবমাননা ও অপব্যবহার

মূলত সাতের দশকের মধ্যলগ্ন থেকে দেশজুড়ে সংবাদপত্রগুলির উপর সেন্সরশিপ চালু হয়েছিল। এর ফলে সংবাদপত্রের কিছু জায়গা ফাঁকা রাখা হতো। সেই কারণে দেশের জনপ্রিয় নেতা যেমন— অটলবিহারী বাজপেয়ী (১৯২৪-২০১৮), মোরারজি দেশাই (১৮৯৬-১৯৯৫), লালকৃষ্ণ আদবানি (জন্ম- ১৯২৭)—দের মতো দেশের অন্যান্য সমস্ত বিরোধী দলের গ্রেফতার হওয়া নেতাদের খবর সংবাদপত্রের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাত না। আমাদের আলোচ্য ছোটগল্পটিতেও ঠিক একইরকমভাবে দেখতে পাই চন্দ্রোদয় তার প্রতিদিনের অভ্যাসমতো খবরের কাগজ খুলেই হতভম্ব হয়ে পড়ে—

কাগজের একেবারে সামনের পাতার বেশ কিছু জায়গা ফাঁকা। মাঝখানের একটা চৌখুপিতে মোটা হরফের লেখা : সরকারি সেন্সর বোর্ডের নির্দেশক্রমে কাগজের কিছু কিছু জায়গা জনস্বার্থে ফাঁকা রাখতে হচ্ছে। আমরা নিরুপায়, ক্ষমাপ্রার্থী।^{২১}

এখানে লেখক সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষের করুণ ও অসহায় দিকটিকে অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন। প্রশাসনের কড়া নজরদারিতে সাংবাদিকদের বাক-স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে হরণ করা হয়েছিল। ধর্মঘট, মূল্যবৃদ্ধি, বিরোধীদের গ্রেফতার ইত্যাদি সংবাদপত্রে ছাপানো সেন্সরের গাইডলাইন মতো



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল। আর এই নিয়মের সামান্যও যদি লঙ্ঘন হত সেক্ষেত্রে প্রশাসন ঐ সংবাদপত্রের অফিস বন্ধ করে দিত। এমনকি অফিসের কর্তৃপক্ষ থেকে কর্মচারী সবাইকে ‘মিসা’-য় গ্রেফতার করে শারীরিক অত্যাচারও চালাত।

গল্পের মুখ্য চরিত্র চন্দ্রোদয়ের রবিবারের কাগজের সাহিত্য বিভাগে গল্প ছাপা হবার কথা। সাহিত্য বিভাগের পাতা খুলতেই তার মন মিশ্র হয়ে উঠল কারণ পাঁচ কলাম জুড়েই তাঁর গল্প ছাপা হয়েছে। কোথাও কোনো ভুল ত্রুটি হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য সে যখন প্রথম ও তারপর দ্বিতীয় অংশ পড়ল তখন সে সন্তুষ্ট হয়ে গেল। এরপর পুরো গল্পটা যখন সে খুঁটিয়ে পড়ল তখন সে বুঝতে পারে তার গল্পের অনেক অংশ চালাকি করে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং কিছু অংশ জুড়ে দেওয়া হয়েছে— এর ফলে গল্পের মানে সম্পূর্ণ পালটে গেছে। এরপর চন্দ্রোদয় ভাবতে থাকে—

সম্পাদক সরোজবাবু যে এটা করেননি, তা পরিষ্কার। সরোজবাবুর ভাষা সে চেনে। তাহলে করল কে? সেন্সর বোর্ড? যিনি বা যাঁরাই করে থাকুন, গোটা ব্যাপারটার পিছনে যে একটা পরিকল্পনা কাজ করেছে তাতে সন্দেহ নেই। লেখাটা এমনভাবে পালটে দেওয়া হয়েছে যাতে পাঠক বুঝতে না পারে, অথচ লেখক ঠিকই টের পান। কোথাও স্বেচ্ছা একটা কমা কিংবা সেমিকোলন পালটে দিয়ে লাইনের মানে পুরো বদলে দেওয়া হয়েছে, কোথাও বা উধাও করে দেওয়া হয়েছে, গোটা প্যারাগ্রাফ। ...তার নিজের লেখার উপর এত তাড়াতাড়ি আপৎকালীন আইনের সাজোয়াগাড়ি কামান দাগবে, তা একবারও মাথায় আসেনি।^{২২}

সংবিধানকে কেন্দ্র করে চন্দ্রোদয় যে গল্পটি লিখেছিল তাতে রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতার মূল উৎসই ছিল একটি পবিত্র গ্রন্থ। হঠাৎই একদিন দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একজন বৃদ্ধ নেতা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে গ্রন্থটিতে যা লেখা (আইন) আছে সেই মতো দেশ না চালিয়ে তাঁর মনমতো গ্রন্থের বিভিন্ন লেখাকে (আইনকে) বাতিল করতে হবে। অতএব নেতার আদেশমতো সংবিধান সংশোধনের কাজও শুরু হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত একটি মাত্র সেমিকোলন ছাড়া আর কিছুই অপরিবর্তিত রইল না। কিন্তু শত চেষ্টা করেও এই সেমিকোলনটিকে নড়ানো সম্ভব হল না। তাই আর কোনো উপায় না পেয়ে বৈজ্ঞানিকদের স্মরণাপন্ন হয়ে একটি অত্যাধুনিক লেসার বন্দুকের সাহায্য নিয়ে কোনোরকমে সেটিকে মুছে দেওয়া হল। এরপরের দিন থেকে ভয়াবহ দুর্ঘটনা শুরু হয়ে গেল। ঐ বৃদ্ধ রাষ্ট্রনেতা ঘুম থেকে উঠে দেখলেন তিনি সেমিকোলনে পরিণত হয়েছেন, তাঁর স্ত্রী কন্ডা, রাষ্ট্রমন্ত্রী হাইফেন এবং সেনাপতি ফুটকিতে পরিণত হয়েছেন। এরপর রাজ্যের সমস্ত মানুষই কোনো না কোনো অক্ষর বা চিহ্নে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে ঐ পবিত্র গ্রন্থটিও সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত সমস্ত রাজ্যব্যাপী ছাপার হরফের মিছিল চলতে শুরু করল ঐ ফাঁকা গ্রন্থের দিকে, সেখানে সকলই যে যার নির্দিষ্ট স্থানে সাবলীলভাবে ছাপা হয়ে যাবার পর ঐ পবিত্র গ্রন্থটি নিজের স্থিতিবস্থা ফিরে পেল, পরিবর্তে গোটা দেশ জনমানবহীন হয়ে পড়ল।

কাগজের সম্পাদক সরোজবাবু চন্দ্রোদয়ের এই গল্পটি শুনে মনে মনে একটু ভুরু কোঁচকালেও শেষ পর্যন্ত তা ছাপতে রাজী হয়ে গিয়েছিলেন। এরপরই দেশ জুড়ে জারি হয়েছিল জরুরি অবস্থা। কেন্দ্রীয় সরকার সংবাদপত্রকে নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার জন্য চালু করেছিল সেন্সর আইন। গল্পকারের কথায়—

ইতিমধ্যে সংবিধানের উপধারা থেকে কাঁচি চলেছে। কালরাতে জারি হয়েছে জরুরি আইন, আজ ভোরবেলায় ট্যাক্স আর সাজোয়াবাহিনী রাস্তায় নেমেছে, আর তার নিজেরই গল্প এক সম্পূর্ণ অপরিচিত ভয়াবহ চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে খবরের কাগজের পাতায়।^{২৩}

সেন্সরের গাইডলাইনের কারণে চন্দ্রোদয়ের গল্পের অভাবনীয় পরিণতিতে সে যথারীতি ভয় পেয়েছিল কারণ গল্পের শেষ ভাগে— ‘হাসি হাসি মুখ যে গল্প লেখকের প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন ইঁশিয়ারি, তা বোঝা এমন কিছু কঠিন নয়।’^{২৪}

এরপর চন্দ্রোদয় বাইরের জগতের সাথে ঠিকমতো যোগাযোগও রাখতে পারছিল না। কারণ যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হল টেলিফোন কিন্তু তার ধারণা ছিল সমাজের এরূপ পরিস্থিতিতে যারা গল্প পালটে দিয়েছে তারা চন্দ্রোদয়ের ক্রিয়াকলাপের খোঁজ রাখার জন্য অনায়াসে টেলিফোনে আড়ি পাতছে। অবশেষে অনেক ভোরে চন্দ্রোদয় বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে দুটি চিরকুট লিখে ফেলেন ‘সে জীবনে হতাশ তাই আত্মহত্যা করছে’।^{২৫} একটি পাঠিয়েছিল পুলিশের ঠিকানায় আর অন্যটি বিধানার উপর বই চাপা দিয়ে দিল। কারণ সে বুঝেছিল এই পরিস্থিতিতে সে ঘরে থাকলে হয় প্রশাসন তাকে জেলে পাঠাবে নতুবা তাকে হত্যা করবে। তাই সে তড়িঘড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা সুধার বাড়িতে গিয়েছিল সেখানে গিয়ে সে জানতে পারে কাগজের সম্পাদককে পুলিশ ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে।

এরপর চন্দ্রোদয় সুধার মুখে সম্পাদক সরোজবাবুর গ্রেফতারের কথা শুনে সুধাকেও গৃহত্যাগ করার কথা বললে সে রাজী হয়নি। এই সময় সমগ্র দেশোজুড়েই পুলিশ-প্রশাসন ধড়পাকড় ও গ্রেফতারি চালছিল। সুধা তার পরিচিত ও বিশ্বস্ত বন্ধু চিত্রার বাড়ির নীচের গোপন কক্ষে (মাটির নীচে তৈরী করা কক্ষ বা Underground) চন্দ্রোদয়কে নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। এর কিছুদিন পর পুলিশ সুধাকেও গ্রেফতার করেছিল তাই চিত্রা আর কোনোরকম ঝুঁকি না নিয়ে চন্দ্রোদয়কে ঘর খালি করে দিতে বলেছিল ফলে সে একপ্রকার নিরুপায় হয়েই রাস্তায় নেমেছিল। কিন্তু তাতেও তার শেষরক্ষা হয়নি। লেখকের ভাষায়—

মৃত্যুর পর চন্দ্রোদয় পরিণত হয় একটি বেয়াড়া সাইজের বস্ময়-চিহ্নে। সেই রাতে দেশের সমস্ত অক্ষর যখন ওই পবিত্র-গ্রন্থে পরপর সাবলীলভাবে ছাপা হয় ও সাংবিধানিক স্থিতিবস্থা ফিরে আসে, তখন ওই বস্ময়ের চিহ্নটি স্বভাবতই ছাপা হয় গ্রন্থের সব শেষে।^{২৬}

আলোচ্য ছোটগল্পটিতে লেখক উত্তাল সাতের দশকের মধ্যলগ্নের সময়কে তুলে ধরেছেন অর্থাৎ এই সময় জরুরি অবস্থা জারি ঘোষণার পর সরকার পক্ষের নেতার উৎসৃষ্টলতা ও দুর্নীতি, ব্যাপক পুলিশি অত্যাচার, সাধারণ মানুষ এমনকি সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ তথা সেন্সরশিপের মতো সমাজের ঘটে চলা বাস্তব ঘটনাগুলিকে উপস্থাপন করেছেন।

এরপর আমরা অরুপরতন বসুর ‘আর্কিমিডিসের লাঠি’ গল্পটির বিশ্লেষণে সচেষ্ট হব। ছোটগল্পটির সূচনাতেই লেখক গল্পটির সময়কাল তুলে ধরেছেন জুলাই ১৯৭৬— এই সময়কাল সাতের দশকের পশ্চিমবঙ্গ এমনকি ভারতবর্ষেরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সময়কাল। এই সময় দেশবাসীর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে জরুরি অবস্থার কুপ্রভাব ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়েছিল। এরূপ অস্থির সময়ে গল্পের মুখ্য চরিত্র রোড তৈরির ঠিকাদার শিবনাথ বাবুর নতুন বাড়ি তৈরীর জন্য জমি খুঁড়তে গিয়ে মিস্ট্রিরা একটা মাঝারি সাইজের টিনের বাক্স খুঁজে পেয়েছিল। আর সেটির ডালা খুলতেই দেখা গেল খবরের কাগজে মোড়া একটা স্টেনগান ও কিছু কাঁচুজ। দেশব্যাপী অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে ঐ স্টেনগান ও কাঁচুজ নিয়ে শিবনাথবাবু মহাচিন্তায় পড়েন। কারণ দেশে জরুরি অবস্থা চলাকালীন তার কাছ থেকে বন্দুক পাওয়া গেলে প্রথমত পুলিশ তাকে গ্রেফতার করবে দ্বিতীয়ত মেটাল রোড তৈরী করে যে এতবড় ব্যবসায়ী হয়েছেন তিনি তার কাজও আর পাবেন না। তাই ব্যাপারটিকে ধামাচাপা দেবার জন্য হেডমিস্ত্রি আব্দুলকে কল্লিত গলায় বলেন— ‘বাক্সটা আমার ঘরে দিয়ে যা, কথা আছে।’^{২৭} এরপর শিবনাথ বাবুর ঘরে এলে হেডমিস্ত্রিকে কথা গোপন রাখার জন্য উপরী দেবারও প্রস্তাব দিয়েছেন— ‘আজ থেকে অন্যদের রোজ দু-টাকা বাড়িয়ে দিচ্ছি, আর তোর নিজের জন্য পাঁচটাকা, কেন বুঝতে পারছিস’।^{২৮}

সাতের দশকের শুরু থেকে জরুরি অবস্থা জারির শেষ সময় পর্যন্ত ঠিকাদার, জোতদার, মজুতদাররা সরকার ও প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন মদত পেয়ে



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ফুলে ফেঁপে ভুইফোঁড় হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে এই সময় দেশের যুব নেতাদেরও ক্ষমতার কোনো অন্ত ছিল না আর এই যুবনেতারা অধিকাংশই উপরিত্তেই বিশ্বাস রাখতেন তাই তাদের কোনোমতেই ক্ষাপানো চলবে না নইলে সব শেষ। যেমন—

কিছুদিন আগেই ছেলে গোবিন্দর মিনিবাসের পারমিটের জন্য এক যুবনেতাকে একটি জাপানি মোটরসাইকেল উপহার দিতে হয়েছে। এবার শিরের সঙ্গে শিরস্ত্রাণ অর্থাৎ ব্যান্ড ব্যালান্সটিকেও উপহার দিতে হবে ভেবে শিবনাথ শিউরে উঠলেন।^{১৯}

এই কথার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের যুবনেতাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তির একটা সম্যকধারণা লেখক আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

শিবনাথ বাবু মিস্ত্রিদের উপর টাকা দিয়েও নিশ্চিত হতে পারেননি কারণ বাইরে গিয়ে রাজমিস্ত্রিরা যদি এই ব্যাপারে কাউকে কিছু বলে দেয়, কারণ ওদের কথার কোনো ঠিক নেই আবার ওদের সাথে সবসময় ঘোরাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কাজই শিবনাথবাবুর পুলিশ আর যুবনেতারা ভরসা তেমনি তাদেরই আবার তিনি সবচেয়ে বেশি ভয় পান। কারণ—

টাকায় টাকা তোলা এক জিনিস আর মাথা বাঁচানোর জন্য টাকা ঢালা আর এক জিনিস। শেষকালে টাকা গেল আবার মাথাও গেল— এই দুই ই যদি একসঙ্গে যায়, তাহলে বরঞ্চ টাকা না ঢেলে মাথা পেতে দেওয়াটাই ঠিক। কিন্তু মাথার সঙ্গে কান, চুলের সঙ্গে পাকড়ি অর্থাৎ সেই প্রাণের সঙ্গে ধনও জড়িত।^{২০}

সাতের দশকের শুরু থেকে জরুরি অবস্থা পেরিয়ে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত প্রশাসন ও যুবনেতাদের ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির কথা লেখক এখানে তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে দেশের তথাকথিত যুবনেতারা ক্ষমতার দস্তাবেজ দুর্নীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েছিল তার প্রমাণ মেলে শিবনাথবাবুর ছেলে গোবিন্দর চরিত্রেও, তাই সে ছেলেকে মোটেও বিশ্বাস করে না—

উঠতি তরুণ নেতা হিসেবে কিছুদিন আগেই তার নামে পাড়ায় পোস্টার পড়েছে, এমনকী যুব প্রতিনিধি হিসেবে বুলগেরিয়া থেকেও ঘুরে আসতে পারে এরকম একটা খবরও কানাদুঘোষে শুনেছিল শিবনাথ। এটা শোনার পরই গোবিন্দ সম্পর্কে তাঁর আস্থা ধাক্কা খেয়েছে। একটি মিনিবাস সম্বল করেই গোবিন্দ এতদূর এগিয়েছে তা বিশ্বাস করা কঠিন। পাড়ার লোকেরা অবশ্য আড়ালে বলে যে, থানার পাশে শনিপুজার আধচলা কাম-জুয়ার আঘড়াটির গোপন মালিকানা নাকি গোবিন্দরই। তবে এসব বিষয়ে গোবিন্দকে প্রশ্ন করেও কোনও লাভ নেই, আজ পর্যন্ত কোনও প্রশ্নের উত্তর তার কাছে পালটে আর একটা প্রশ্ন হয়ে ফিরে আসেনি এমন নজির কম।^{২১}

মাটি থেকে স্টেনগান পাওয়ার ঘটনায় গোবিন্দ তার বাবাকে পুলিশকে টাকা দিয়ে ঝামেলা থেকে মুক্ত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে এবং হেডমিস্ত্রি আবদুলকে সে নিজে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেবে সেকথাও বলেছে। ছেলের এই কথায় শিবনাথবাবু ব্যথ্য হয়ে কঠিন স্বরে বলেন—

আমার মিস্ত্রিদের একটির গায়ের যেন আঁচড় না লাগে, তোর নেতাগিরি বাড়িতে চলবে না গোবিন্দ।^{২২}

একথা শুনে গোবিন্দ ঠাণ্ডা গলায় তার বাবাকে বলেছিল—

তাহলে বাস্তবের মাল আমায় দিয়ে দাও, আমি ব্যবস্থা করছি।^{২৩}

এই কথাতেই বোঝা যায় সেসময় ছেলে গোবিন্দর মতো যুবনেতারা কি পরিমাণ উদ্ধত ছিল এবং দেশের আইন-কানুনকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ক্ষমতার দস্তাবেজ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি চরিতার্থ করতো, কিন্তু পাকা মাথার ব্যবসায়ী শিবনাথবাবু তার ছেলেকে এক বিন্দুও বিশ্বাস করতো না, তাই ছেলেকে সাবধান করে বলে দেন— ‘দেখ ঘুনাফরেও যেন কেউ জানতে না পারে, জানলে দুজনেই শেষ।’^{২৪} একথা শুনে গোবিন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বলে— ‘আমাকে আর কে বিপদে ফেলবে? বিপদ হলে তোমারই হতে পারে।’^{২৫} ছেলের কাছে এরকম শিবনাথবাবু খুব অসহায়বোধ করেছিলেন।

এরপর এই ঘটনা থেকে মুক্তির কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ শিবনাথবাবুর তার ছোটবেলার বন্ধু ভূপতির কথা মনে পড়ে। পুলিশ তার ছেলে রঞ্জকে গুলি করে হত্যা করেছিল। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশায় বন্ধুর পরামর্শের জন্য যখন শিবনাথবাবু তার বন্ধুর বাড়ির দিকে রওনা হচ্ছিল তখন স্টেনগানের কথাটা চাউর হয়েছে কিনা তা বোঝার জন্য তিনি অতি সচেতন ভাবে চারিদিক লক্ষ্য করতে করতে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এরপর যখন বুঝলেন কেউ তাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করছে না তখন খবরটা বাইরে বেরোইনি ভেবে তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন। এরপর শিবনাথবাবু ভূপতিকে তার সমস্যার কথা জানালে ভূপতি যাদের জিনিস ওটা তাদেরকেই ফেরত দেওয়ার কথা বলেছিল কিন্তু শিবনাথবাবু সত্যিই জানেন না যে কে এ আশ্রয় অস্ত্রটিকে তাঁর জমিতে পুতে দিয়ে গেছে। সেকথা শুনে ভূপতিকে বলেছিল—

কী যে বলা, ... আর্কিমিডিসের গল্পটা জানো তো? সেই যে সাইরাকিউজের সেই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, যিনি বলেছিলেন, গোটা পৃথিবীটাকেই আমি তার রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে পারি, যদি পৃথিবীর বাইরে দাঁড়ানোর মতো একটা জায়গা পাই। তা এখন তো দাঁড়ানোর জায়গা পাওয়া গেছে, কিন্তু আর্কিমিডিসের লাঠি যারা ব্যবহার করবে তাদের জন্য পুলিশের আলাদা ফাইল আছে এটা জান?^{২৬}

বন্ধুর বাড়ি থেকে নিজের আসার সময়ও শিবনাথবাবু সর্বত্র দৃষ্টি নিয়েই ফিরছিলেন। রাস্তায় পুলিশের গাড়ি দেখে তিনি অত্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু আড়চোখে দেখে বুঝতে পারেন যে পুলিশ চা খাওয়ায় মনোনিবেশ করেছে। এরপর তিনি ভাবনা চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন— গভীর রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে যাওয়ার পর অতি সন্তর্পণে মাটির নীচে এ বাস্তুটিকে পুনরায় পুঁতে ফেললেন। গল্পকারের ভাষায়—

আর্কিমিডিস একবার বলেছিলেন পৃথিবীর বাইরে দাঁড়ানোর মতো একটা জায়গা পেলে গোটা পৃথিবীটাকেই তার রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। আমাদের শিবনাথবাবু আর্কিমিডিস নন, কারাই বা নতুন আর্কিমিডিস তাও তাঁর জানা নেই, ফলে বন্ধুককে কীভাবে আর্কিমিডিসের লাঠির মতো ব্যবহার করতে হয় তাও তিনি জানেন না। অথচ এসব কিছু না জেনেই অসময়ে জমি খুঁড়ে এক ভয়ানক বিপদ তিনি ঘরে ডেকে এনেছিলেন। ভাগ্য বলতে হবে, শেষপর্যন্ত অন্তত এটুকু বুঝতে পারলেন যে আর্কিমিডিসের ওই লাঠিকে আপতত মাটির নীচে লুকিয়ে রাখাই হবে সবচেয়ে ভালো।^{২৭}

আলোচ্য গল্পটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর পুলিশ প্রশাসন ও কংগ্রেসের যুবনেতাদের সমাজে কীরূপ ভূমিকা ছিল। শিবনাথবাবু যদি পুলিশকে টাকা দিতেন তাহলে তাঁর টাকাও যেত এবং বন্ধুক রাখার অপরাধে জেলও খাটতে হতো। এই কারণে শিবনাথবাবু তাঁর ছেলেকেও বিশ্বাস করতে পারেননি। শেষমেষ এই সমূহ বিপদ থেকে বাঁচতে আর কোনো উপায় না পেয়ে স্টেনগান সহ বাস্তুটিকে মাটির তলাতেই পুঁতে দিয়েছিলেন।

এবারে আমরা একালের জনপ্রিয় ছোটগল্পকার রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের (জন্ম-১৯৫৬) সাতের দশকের জরুরি অবস্থার আবহে সমাজে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কেন্দ্র করে লেখা ‘পেয়ারাবুড়ো পান্তাবুড়ি’ গল্পটি নিয়ে আলোচনা করবো।



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

আলোচ্য ছোটগল্পটি বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করব যে সাতের দশকে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার ফলে কীভাবে গ্রাম-গঞ্জের নিম্নবিত্ত মানুষেরা আর্থিক দিক থেকে একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছিল। এছাড়াও সরকার পক্ষের রাজনৈতিক নেতারা তাদের অনুগতদের বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দিত ও সুযোগ পেলেই এরা সমাজের আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষদের উপর নানাভাবে অত্যাচার চালাত। আর সেই ছবিই লেখক আলোচ্য ছোটগল্পটিতে হাস্যরসের মাধ্যমে অসাধারণ দক্ষতার সাথে উপস্থাপন করেছেন।

এখানে গল্পকার রূপকথা শোনানোর ভঙ্গিতে গল্পটি শুরু করেছেন— ‘এক গাঁয়ে এক পেয়ারাবুড়ো আর এক পান্তাবুড়ি থাকে।’^{১৬} গাঁয়ের একেবারে একেকোনায় তাদের দুটি বুপড়ি রয়েছে। পেয়ারাবুড়োর বুপড়িটা পূবমুখো এবং পান্তাবুড়ির বুপড়িটা পশ্চিমমুখো— শুধু মাঝখানে একটা পুকুর রয়েছে।

বুড়োর একমাত্র অবলম্বন ছিল একটা সুস্বাদু পেয়ারা গাছ। সেগুলি সে গ্রামের ছেলে-পুলেদের পাঁচ নয়া, দশ নয়া করে বিক্রি করত। বুড়োর তিন কুলে নিজের বলতে কেউ নেই। অন্যদিকে পান্তাবুড়ি পুকুর থেকে গুলি, শামুক সংগ্রহ করত এবং গ্রামের এর ওর ঘরে এটা-ওটা কাজ করে এক পো-আধ পো যা চাল পেত তা তার কুঁড়ে ঘরে নিয়ে আসত। বুড়িরও আপন বলতে কেউ নেই। তবে তার বাতিক ছিল কেবল পান্তা ভাতে, তাই সে সন্ধ্যাবেলায় ভাত রন্ধে রাখত আর সকালবেলায় বাসি গুলির ঝাল দিয়ে পান্তাভাত খেত। তবে মজার বিষয় এই যে পেয়ারাবুড়ো পান্তাবুড়িকে দেখিয়ে দেখিয়ে পাকা পেয়ারা খেত অন্যদিকে পান্তাবুড়িও ঠিক একই ভাবে পেয়ারাবুড়োকে দেখিয়ে দেখিয়ে সানন্দে পান্তা ভাত খেত।

কিন্তু অভাব-অনটনকে নিত্য সঙ্গী করে কখনো কখনো তাদের অনাহারেও দিন কাটতে হত। একদিন হঠাৎ করে পেয়ারাবুড়োর সখ হল সে পান্তাভাত খাবে অন্যদিকে পান্তাবুড়িরও ইচ্ছে হল যে সে বুড়োর গাছের পেয়ারা কুড়িয়ে এনে খাবে। তাই মাঝরাতে দুজনেই একে অপরের পেয়ারা ও ভাত চুরি করবে বলে ঠিক করল— ‘খিদে পেলে তবু সামলানো যায় কিন্তু লোভ সামলাবে কে?’^{১৭}

এই লোভ সংবরণ করতে না পেরে দুজনেই যে যার কুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। বুড়ি পেয়ারাতলায় পৌঁছে দেখে যে একটাও পেয়ারা মাটিতে পড়ে নেই তাই সে বাধ্য হয়ে গাছে উঠে আচলভর্তি করার জন্য পেয়ারা পাড়তে থাকে ততক্ষণে বুড়ো পান্তাবুড়ির বুপড়িতে ঢুকে গুলির ঝাল দিয়ে তিনভাগ ভাত খেয়ে ফেলেছে এবং পেটভর্তি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বাকিটুকুও যখন সাবাড় করে দিতে উদ্যত— এমন সময় বুড়ি তার ঘরের দিকে খেয়াল করতেই বুঝতে পারে যে তার বুপড়িতে বুকি চোর ঢুকছে। তার টিনের জামবাটি, গুলির ঝালের বাটি, সের পাঁচেক ধান, দুটো তালাই, ছেঁড়া কাথা সর্বশ্ব চুরি হয়ে যাচ্ছে ভেবে বুড়ি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে চোর-চোর বলে চিৎকার করে ওঠে অন্যদিকে বুড়োও পেয়ারা গাছের দিকে তাকিয়ে চোর-চোর বলে চোঁচাতে থাকে। বুড়ির তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে গ্রামের বিশ-পঞ্চাশ জন লোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। এদের মধ্যে আবার জনা চারেক লোকের হাতে বন্দুকও ছিল। তারা অন্ধকারে পেয়ারাগাছের কাছে যাকে পায় তাকে দু ঘা দিয়ে টর্চের আলোয় দেখে যে সে পান্তাবুড়ি, তখন পান্তাবুড়ি বেরিয়ে আসা গ্রামের লোকদের উদ্দেশ্যে করে তার কর্কশ কণ্ঠে বলে ওঠে— ‘আরে চোর আমার ঘরে রে মুখপোরা।’^{১৮} তখন গ্রামবাসীরা পান্তাবুড়ির ঘরের দিকে ছুটে গিয়ে যে ছিল তাকে দু-চার ঘা মেরে টর্চ জ্বলে দেখল এতো পেয়ারাবুড়ো।

এরপর বুড়োকে গাঁয়ের হাটতলায় শাস্তি দেবার জন্য আনা হল। গ্রামবাসীদের মধ্যে গৌর নামের একজন বলে— ‘বেঁধে জল বিচেতি লাগা।’^{১৯} বট নন্দী নামের অন্য একজন বুড়োর কান ধরে টানতে টানতে শিবদালনে নিয়ে গিয়ে সেখানে বুড়োর মাথা সিমেটে ঠুকতে ঠুকতে বলল— ‘বল শালা দিবি করে আর কখনো চুরি করবি’।^{২০} ঠিক সেই সময় সেখানে রাজনৈতিক নেতার ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা আঠাশ বছর বয়সী পান্নালাল হাজির হয়েছিল। আসলে সাতের দশকের শুরু থেকেই পান্নালালের মতো যুবক ছেলেরা যারা কংগ্রেসী নেতাদের প্রিয়ভাজন ছিল তাদেরও সেসময় এলাকায় অসীম ক্ষমতা ছিল। লেখকের ভাষায়—

পান্নালাল পূবপাড়ার ভূপতি বাড়ুজের ছেলে। বয়স এমন কিছু বেশি নয়— গোটা আঠাশ। স্বাধীনতার বছর জন্ম। বহুদিন চাকরিবাকরি পায়নি। গরবেতার মুকুন্দ চৌধুরী সত্তরের প্রথমদিকে ভোটে দাঁড়াল আর তাতে খাটার দরুন কলকাতার ফ্যাক্টরিতে কাজ পেয়েছিল। এ বছর ভাগ্য খুলে যায় একসঙ্গে তিনখানা সরকারি চাকরি চিঠি পেয়ে। জরুরি অবস্থা ঘোষণার পাঁচ মাসের মধ্যে তিন তিনখানা চাকরি চিঠি দেখে সবাই ভাবল এরপর সব বেকাররাই চাকরি পাবে। পান্নালালের পিছনে এখন অমন বিশজন ছেলে ঘোরে। মুকুন্দ চৌধুরী কি অন্য কাউকে বলে যদি একটা চাকরি জুটে যায়। সেই মুকুন্দ এসে বাপ করে টিপে ধরল পেয়ারা বুড়োর ঘাড়টা।^{২১}

একথা থেকে বোঝাই যায় যে সাতের দশকে শুরু থেকে জরুরি অবস্থার শেষ সময় পর্যন্ত নেতার ছত্র-ছায়ায় থাকলেই অনায়াসেই মনোমত চাকরি পাওয়া যেত। এছাড়াও সেসময় গ্রাম-গঞ্জের নেতা বা তাদের সহযোগীদের যে ক্ষমতা ছিল তার দ্বারা গ্রামবাসীদের নিজেদের দাস বলে মনে করত। এমনকি তাদের ইচ্ছামতো কোনো গ্রামবাসী না চললে তার ফল বাবদ তাকে হয় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হতে হত নতুবা নানাভাবে অমানবিক অত্যাচার সহ্য করতে হত। আর আমাদের আলোচ্য ছোটগল্পে নেতা মুকুন্দ চৌধুরীও পান্নালালের দলের পেয়ারাবুড়োর ঘাড় ধরার পিছনেও একটা কারণ ছিল সেটি হল—

৬৯ সালে একটা সাক্ষী দিয়েছিল পেয়ারাবুড়ো। পেয়ারাবুড়োর তখন দিনকাল বড়ো খারাপ। ভেবেছিল উদ্বৃত্ত জমি উদ্ধার হলে সেও খানিক পাবে। তাই ভাগচাষীদের দলে সেও জুটে গিয়েছিল। সাক্ষী দিয়েছিল কোর্টে। সে ইতিহাস অনেকেরই জানা। এই মুহুর্তে পান্নালাল সুযোগটা পেয়ে গেল। তখন দলে যুবকরা ছিল না, তার লোক সাগর চক্রবর্তীকে বড়ো ভুগিয়েছে এরা। আজ সুদে-আসলে ফেরত দিয়ে দেবে।^{২২}

যুবক পান্নালাল ও তার দলবল এরকম একটা সুযোগেরই সন্ধান ছিল। তাই বুড়োকে এভাবে হাতের মুঠোয় পেয়ে হংকার দিয়ে তার স্বাদের পেয়ারা গাছ কেটে ফেলার কথা বলে এরপর বুড়োকে তাদের কথামতো ‘পানাপুকুরে ডুবিয়ে কুলোর বাতাস করে দিল’।^{২৩} গল্পকার এখানে সাতের দশকের কংগ্রেসের যুব-সম্প্রদায়ের ঔদ্ধত্য, উৎসুকতা ও অমানবিক অত্যাচারের কথা তুলে ধরেছেন।

এই ঘটনা চলাকালীন দু-তিন জন পাশের গাঁয়ের প্রভাবশালী নেতা বিজন ঘোষকে খবর দেওয়ায় সে খদ্দেরের পাজমা, গায়ে কাশ্মীরি শাল পরে মোটরসাইকেলে করে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সেসময় উন্মত্ত যুবসমাজ বুড়োর সখের পেয়ারাগাছ কাটতে উদ্যত। এরপর বিজন ঘোষ শালটা মোটরসাইকেল রেখে পাঞ্জাবীটা একটু তুলে এমনভাবে পেট চুলকাতে লাগল যেন গ্রামবাসীরা তার কোমরে রাখা পিস্তলটা অনায়াসেই দেখতে পায়। তারপর নেতাসুলভ ভঙ্গিতে বুড়োর চুরির কথা শুনে বলেন—

এখন দেশে অনুশাসন পর্ব চলছে। চুরি, ঘুষ এসব মিসাতে আটকাবার মতো কেস। বললেই বড়বাবু থানায় তুলে নিয়ে যাবে। তবে পান্না তোর গাঁয়ের লোক, তার মুখ চেয়ে ছেড়েই দিলুম। সবসময় আইন দিয়ে হয় না, ভালোবাসা দিয়ে অন্যায়কে রুখতে হয়।^{২৪}

বিজন ঘোষ সে সময় যে অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তি (নেতা) ছিলেন তা তাঁর কথাতে ও কোমরে সবসময়ে পিস্তল রাখার মতো ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে যায়। এছাড়াও তিনি যে জরুরি অবস্থার পক্ষপাতি ছিলেন এবং গ্রামবাসীদের অনুশাসন পর্ব মানতে বাধ্য করতেন তাও তার বাচনভঙ্গিতে



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিজন ঘোষ চাইলেই বুড়োকে অনায়াসে গ্রেফতার করতে পারতেন। আসলে সেসময় মিসায় যাকে খুশি কোনো কারণ না দেখিয়েই গ্রেফতার করা যেত। তবে এখানে বুড়োকে গ্রেফতার না করিয়ে বিজন ঘোষ আসলে এলাকার মানুষের কাছে পরোক্ষে নিজেরই ভাবমূর্তিকে আরও উজ্জ্বল করতে চেয়েছেন।

গল্পের পরবর্তী অংশে আমরা দেখি এই ঘটনার কয়েক মাস কাটার পর অভাবের তাড়নায় পেয়ারাবুড়ো ও পান্তাবুড়ির অবস্থা আগের চেয়ে আরও খারাপ হয়ে যায়। খিদের জ্বালায় পেয়ারাবুড়ো শেষপর্যন্ত একদিন রাতে মাঠ থেকে পাকা ফুটি চুরি করে, সে সময় পাহারাদাররা তাকে ধাওয়া করলে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে বুড়ো বুড়ির ঘরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে। বুড়িও পাহারাদারদের মিথ্যে কথা বলে বুড়োকে বাঁচায়। এরপর বুড়ো কৃতজ্ঞতার সুরে বুড়িকে বলেছে— ‘তোমার জন্য পরানটা বাঁচল। ফুটিটা তুই খা’^{৪৭} বুড়ি ফুটিটা খেতে না চাইলে বুড়ো পুনরায় বলে— ‘তোমার খিদেয় আর আমার খিদেয় তফাৎ কি বল? তুই খা’^{৪৮} এই কথাটি বলেই বুড়ো খানিকটা ফুটি বুড়ির মুখে গুঁজে দেয়। অনুরূপভাবে বুড়িও কিছুটা ফুটি বুড়োর মুখে গুঁজে দেয়। এইভাবে তাদের কথোপকথনে রসলাপ জমে ওঠে। গল্পকার গল্পের শেষাংশে তাদের সংলাপে হাস্যরস ও কিছুটা রোমান্টিকভাবনা মিলিয়ে গ্রাম বাংলার সাতের দশকের রাজনীতির কথা দক্ষতার সাথে উপস্থাপন করেছেন—

বুড়ো বলে— আমার গাছের পেয়ারা যখন ইচ্ছে খাবে দিনে খাবে—রাতে খাবে।

বুড়ি বলে— আমার পান্তা যখন ইচ্ছে খাবে। দিনে খাবে—রেতে খাবে।

বুড়ো বলে— শালারা তোদের গাছে খেতে গেছে?

বুড়ি বলে— মুখপোড়ারা তোদের ঘরে খেতে গেছে?

বুড়ো বলে— শালারা রেতে রেতে জমি কিনেছিস জানিনি বুঝি?

বুড়ি বলে— বাঁধা রেখে গয়না ফেরত দিসনি তার আবার এত গরম? দুবো হাটে হাঁড়ি ভেঙে।^{৪৯}

গল্পকার আলোচ্য ছোটগল্পটিতে সাতের দশকের সমাজের অস্থির রাজনৈতিক পটভূমিকে আমাদের সামনে কৌতুক রসের মিশ্রণ ফুটিয়ে তুলে ধরেছেন। সেসময় যুব-সম্প্রদায়ের উৎসৃষ্ট উত্তেজনা ও বাড়-বাড়ন্ত, মিসায় গ্রেফতার, অসহায় মানুষের প্রতি শাসক শ্রেণির নেতাদের অত্যাচার ও তাদের বে-আইনি কাজ করে ফুলে ফেঁপে ওঠা ইত্যাদি রাজনৈতিক ঘটনা আলোচ্য ছোটগল্পটিতে দেখানো হয়েছে।

চার.

জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের পরে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সালের ২১ জুন জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসায় রাজ্যবাসী সাতের দশকের অগ্নিগর্ভ দমবন্ধকর পরিস্থিতি থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছিল। এই সরকার ক্ষমতায় এসে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। সেই নীতি ও সিদ্ধান্ত অবলম্বনে বেশ কিছু ছোটগল্পও লেখা হয়েছিল। এবারে আমরা সেই ছোটগল্পগুলি বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করব।

গুণময় মান্নার (১৯২৫-২০১০) ‘সহাবস্থান’ গল্পটির মধ্য দিয়ে সাতের দশকের শেষদিকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। সেসময় বামফ্রন্ট সরকারের সাথে কৃষক সম্প্রদায় শ্লোগান তুলেছিল যে জমিতে চাষ করবে, জমি তার হবে। আর এই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে জোতদার ও স্থানীয় নেতারা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র জমি দখলে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল।

আলোচ্য ছোটগল্পটি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই— রাধাপুর গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারমশাই চল্লিশ বছরের অজিত সরকার মুনিষ খাটা লোকদের ও ভাগচাষীদের একত্রিত করে তার রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে গ্রামে অনেকরই জমি জবরদখল করেছিল। এই অজিত সরকারের নেতৃত্বে যে ঘটনাটি ঘটেছিল তা হল—

সেদিন সকালে ওলাইচণ্ডীর থান যে বটতলা, সেখানে জনাবিশেক লোক জমায়েত হয়ে লালপতাকা ওড়াল এবং ইনকিলাব জিন্দাবাদ, সর্বহারা এক হও ইত্যাদি আওয়াজ দিতে লাগল। তাদের সঙ্গে এনেছিল কোদাল, লাঙল, হেলে এবং দু চারটে বাঁশের লম্বা লাঠি। শাবলও ছিল দু একটা, মাঠে ঠিক সেসবের কাজ ছিল না, তবে প্রয়োজনে হাতিয়ার হতে পারত।^{৫০}

এই অজিত সরকারের মতো লোকেরা গ্রামের দিন আনা খেতে খাওয়া দরিদ্র মানুষদের একত্রিত করে অন্যদের জমির চারকোণায় চারটে করে কঞ্চি বা বাতার ডগে লাল পতাকা বেঁধে পুঁতে দিয়েছিল। এর দ্বারাই তার অন্যের জমি জবরদখল করার প্রয়াস পরিস্ফুট হয়েছে। আর এই জমি জবরদখল করার কারণ দেখানো হয়েছে যে গ্রামে কিছু লোকের অতিরিক্ত জমি রয়েছে আবার কেউ কেউ নিজের জমি নিজের হাতে চাষ করে না। গ্রামের লোকেরা এই ক্ষমতাবাদী নেতা অজিত সরকারের ভয়ে কিছু বলতে সাহস পায় না। এমনকি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে একজন অন্যজনের সাথে মনের কথাও খুলে বলতে পারে না। কিন্তু জবরদখল করা জমিগুলির মালিকদের মধ্যে একজন ছিলেন সুধীর দাস। তার গ্রামে জমি থাকলেও সে খড়গপুরে চাকরি করে কিন্তু সে চাকির প্রতি উৎসাহী। জমি দখলের খবর পেয়ে সাহসী সুধীর দাস অজিত সরকারের বাড়ি মেয়ে অনুপূর্ণার (ডাক নাম অনু) হাত ধরে তার সাথে যেতে বললে অনু রাগান্বিত কণ্ঠে বলে ওঠে— “এ কি মগের মলুক নাকি...”^{৫১} উত্তরে সুধীর দাস তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে বলেছিল—

...তোমার বাপ আমার জমিতে লাল পতাকা পুঁতে দিয়ে চাষ দিয়ে দিল, তাতেই জমি তার হয়ে গেল...তেমনি আমিও তোমার মাথায় লাল পতাকা গুঁজে দিলাম, তুমি আমার হয়ে গেলে, ব্যাস!^{৫২}

এই ঘটনার পরেই কালীচক থানায় প্রথমে অজিত সরকার ও তার আধ ঘন্টা পর সুধীর দাস একে অপরের বিরুদ্ধে ডায়রি করেছিল। এরপর অনুপূর্ণাকে নিয়ে গ্রামে ও স্কুলে নানারকম কথা রটে গিয়েছিল। সেকথা অনুপূর্ণার মা তার বাবাকে জানিয়েছিল পরে অনুপূর্ণাও একপ্রকার মরিয়া হয়ে তার বাবাকে বলেছিল— “বাবা, শুন, তুমি আমায় সুধীর দাসের সঙ্গেই বিয়া দিয়ে দাও...”^{৫৩} — এমনকি এই বিয়ে হলে সুধীর দাসের সব সম্পত্তি তার বাবার হয়ে যাবে সে কথাও সে তার মাকে বলেছিল।

অজিত সরকার যে পার্টির ক্ষমতায় বলীয়ান হয়েই গ্রামের লোকের জমি অন্যায়ভাবে জোরপূর্বক জবরদখল করেছিল সেকথা আলোচ্য গল্পটি পড়লেই তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এই ছোটগল্পটির মধ্য দিয়ে আমরা তৎকালীন সাতের দশকের শেষদিকের গ্রামবাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা সামগ্রিক চিত্র খুঁজে পাই।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ইতিহাসে ১৯৭৭ সালের ২১ জুন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্য সরকার কর্তৃক ‘অপারেশন বর্গা’ [১৯৭৯] কর্মসূচী রূপায়নের যে প্রক্রিয়া চলেছিল তা একালের বিশিষ্ট ছোটগল্পকার গুণময় মান্না তাঁর ‘ব্লাড প্রেসার’ গল্পে অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই গল্পটি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির পালাবদলের ফলে নতুন সরকার আসার পর পার্টির নেতা ও তাদের অনুগামীরা পাড়া থেকে মহল্লায়, এ রাস্তা থেকে ও রাস্তায় শ্লোগান তুলেছিল—

ইনকিলাব জিন্দাবাদ, কৃষি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করতে হবে করতে হবে, ক্ষেত মজুরদের নিম্নতম বেতন মানতে হবে, অমুক নেতা যুগ যুগ



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

জীও, অমুক পার্টি জিন্দাবাদ, দুনিয়ার মজুর চাষী এক হও এক হও, শ্রেণীশত্রু নিপাত যাক নিপাত যাক...।^{৬৪}

আলোচ্য গল্পে এরূপ উত্তপ্ত রাজনৈতিক আবহে প্রায় ৭০ বছর বয়সী বৃদ্ধ মতিলাল খাঁ ও তার ছেলে শ্রীপতি খাঁ দুজনের মধ্যে ভাগচাষের জমিকে রেকর্ড করানো সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে বারংবার পারিবারিক মনোমালিন্য ও ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে। আসলে মতিলাল বিশু রায়ের আড়াই বিঘে ও চরণ হালদারের চার বিঘে জমি ভাগে চাষ করে। কিন্তু মতিলাল কখনই জমি মালিকের জমি নিজের নামে রেকর্ড করাতে চায় না। অন্যদিকে ছেলে শ্রীপতি গ্রামের আর সবার মতো লোভের বশবর্তী হয়ে পড়ে পার্টির স্থানীয় নেতা ও অনুচরদের কাছে নাম নথিভুক্ত করতে চায়। কিন্তু মতিলাল ছেলেকে বাধা দিয়ে বলে এসব অধর্মের কাজ না করতে, শ্রীপতি সেকথাই আমল দিতে চায় না। অন্যদিকে পার্টির লোক প্রতিনিয়ত গ্রামে ঢাড়া পিটিয়ে বলে যাচ্ছে—

চাষী ভাইরা, তোমরা যারা ভাগ চাষ কর, তারা আমাদের অফিসে এস, তোমাদের চাষ রেকর্ড করিয়ে দেব? ^{৬৫}

এরপর সমগ্র গ্রামের মানুষদের বিশেষ করে ভাগচাষীদের মধ্যে ভাগচাষের রেকর্ডের ব্যাপারটি যে ধীরে ধীরে ব্যাপক গুরুত্ব পেয়েছিল তা গ্রামের এক ভাগচাষী প্রসাদ যখন মতিলালের সাথে কথা বলতে এসেছিল তখন তার কথোপকথনে স্পষ্ট হয়েছিল—

শুনেছ মতিদাদা, ই মাসের বিশ তারিখে গবরমেন্টের সাহেব আসছে ই তল্লাটে...

কেনে বল দিকি... গবরমেন্টের সাহেব কে গো... মতির হাত থামেনি কথা শুনেছ, আর বলছে।

সেটেলমেন্টের বাবু গো, মাঠে মাঠে ক্যাম্প (অ-কারান্ত) হবে, যেয়ে বলবে, ই জমি কার, মালিক বলবে আমার, বেশ, ই জমি কে চাষ করে, না, আমি করি, ই কথা বলবে চাষী, বাস, চাষীর নামে রেকর্ড... ভাগ রেকর্ড...

... ..

ইটা খুম ভাল হল, নাকি বল, মাতদা?

ভাল-মন্দ কী জানি, ভাই, বলে নিজের দেহ নিজে লয়, তায় আবার ভালমন্দ বিচার... তা, তুমি যাচ্ছ কোথা?

এই যাচ্ছি এগবার শিবমাড়ায়, পাঁচ জনা যাচ্ছে, পার্টির বাবুরা মীটিন্ ডেকেছে, শুনে এসি পাঁচটা ভাল-মন্দ কথা...

তা যাও, ভাই যাও...।^{৬৬}

এরপর শ্রীপতি গ্রামীণ নেতা ও তার সঙ্গ পাল্লদের কাছে ভাগচাষের রেকর্ডের জন্য মতিলালের নাম লিখিয়েছে একথা শুনে মতিলাল ছেলের সাথে ঝগড়া করেছে। শারীরিক অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে ঐ বৃদ্ধ সন্ধ্যাবেলায় নিজের নাম কাটাতে গেছে। এমনকি স্থানীয় কমরেড নেতা সুবোধ পোদ্দার ও তার অনুগামীদের এটাও বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে এই নিয়মটা ঠিক নয় কারণ সব চাষী তো ভাগে চাষ করে না ফলে এই পদ্ধতিতে সব চাষী কখনই উপকৃত হতে পারবে না। আর কিছু মানুষ লোভের বশবর্তী হয়ে ভাগে চাষ করে বলে মিথ্যে কথা বলবে এর ফলে এই রেকর্ড ব্যবস্থা গ্রামের সাধাসিধে মানুষগুলোকে অসৎ করে তুলবে। আসলে গল্পকার এই গল্পে বাম আমলের ‘অপারেশন বর্গা’ কর্মসূচীর দ্বিধাযুক্ত মনোভাবের পরিচয় তুলে ধরে সমালোচনা করেছেন।

পাঁচ.

সাতের দশকে পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এই দশকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অজস্র রাজনৈতিক ঘটনার সাক্ষী থেকেছিল পশ্চিমবঙ্গবাসী। এর মধ্যে বেশ কিছু রাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য ছোটগল্প রচিত হয়েছিল। এবারে আমরা সেই সমস্ত ছোটগল্পগুলির মধ্যে কয়েকটি ছোটগল্পকে সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

প্রথমেই আমরা কালিদাস রক্ষিতের (জন্ম-১৯৩০) ‘অপারেশন’ ছোটগল্পটি নিয়ে আলোচনা করব। ১৯৭৪ সালের ৮ মে ভারতের রেলমন্ত্রী ললিত নারায়ণ মিশ্রের হুমকিকে কার্যত অগ্রাহ্য করে ২০ দিন ধরে সারা দেশে রেল কর্মচারীরা তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট পালন করেছিল যার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গেও পড়েছিল। আলোচ্য গল্পে আমরা দেখতে পাই রেল ধর্মঘটীদের মনোভাবকে ভেঙে ফেলার জন্য কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকার [যে রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস সরকার ছিল] নানা ভাবে দমন-পীড়ন ও অত্যাচার চালিয়েছিল। অপরদিকে অগণিত রেল ধর্মঘটীরাও সরকার ও প্রশাসনের সমস্ত প্রতিরোধের বিরুদ্ধে নিজেদের সিদ্ধান্ত অনড় থেকে দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে।

গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই রেল ধর্মঘটের শুরুর দিন থেকে বাতাসিয়া জংশনে একটি রেল আটকে পড়েছিল। রেল চলাচল স্বাভাবিক রাখতে সরকার প্রচুর পরিমাণে সি.আর.পি মোতায়েন করেছিল। কিন্তু ঐ রেলের ড্রাইভার রতনলাল ধর্মঘটীদের একজন হওয়ায় গা ঢাকা দিয়েছিল। অন্যদিকে রেল চলাচল স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসন রতনলালকে খোঁজার জন্য মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছিল। পরে তার খোঁজ পেয়ে সি.আর.পি চাষির ঘর থেকে তাকে শেকল দিয়ে বেঁধে আনলেও প্রশাসনের শত চেষ্টাতেও সে ট্রেন চালায়নি। অন্যদিকে মঙ্গল সুভাষের মতো কিছু রেল ধর্মঘটী চাকুরি হারাবার ভয়ে কাজে যোগ দিয়েছিল। এইভাবে শেষ পর্যন্ত লেখক রেলকর্মঘটীদের মধ্যে দ্বিধাযুক্ত মনোভাবের পরিচয় আলোচ্য ছোটগল্পটিতে তুলে ধরেছেন।

গল্পকার অজিত মুখোপাধ্যায়ের (জন্ম- ১৯২৯) ‘একশো ষাট জন’ গল্পটিতে সাতের দশকের শ্রমিক আন্দোলনের কথা রয়েছে। গল্পটিতে শ্রমিকদের নানা রকম দাবি-দাওয়া নিয়ে পরিতোষদের কারখানার বঞ্চিত শ্রমিকরা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। তবে এই আন্দোলনে কোনো রাজনৈতিক দলই তাদের প্রত্যক্ষ এমনকি পরোক্ষভাবেও সাহায্য করেনি। সাতের দশকের শুরুর দিকে পরিতোষের দাদা মনোতোষকে ঐ কারখানারই বিরোধী পার্টির নেতা ভীমের দলের লোকেরা খুন করেছিল। তাদের উপযুক্ত জবাব দিতে পরিতোষের মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহাও লক্ষ্য করা যায়। কারখানার এই ধর্মঘটকে সফল করার জন্য সে কারখানার সমস্ত শ্রমিকদের একত্রিত ও সঙ্গবদ্ধ করার অনবরত প্রয়াস চালিয়ে গেছে। তার দাদার বন্ধুর সাথে পরিচিত হয়ে আনন্দে আপ্লুত হয়েছিল। কারণ তার দাদার বন্ধু বলেছিল মনোতোষের স্বপ্ন ব্যর্থ হবে না। কারখানার ধর্মঘটকে সফল করার উদ্দেশ্যে দেওয়ালে পোস্টার সাঁটা হলে স্থানীয় থানার বড়বাবু অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল, কারণ তাতে কোনো রাজনৈতিক দলের কথা সেখানে লেখা ছিল না। সমগ্র গল্পটি জুড়েই প্রায় একটা লড়াইয়ের কথা গভীরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। কারখানার যে লড়াইয়ের পূর্বে মনোতোষরা নেতৃত্ব দিয়েছে তাকে খুন করাতেও সেই লড়াই থেমে যায়নি। পরে সে লড়াইয়ে এখন পরিতোষরা নেতৃত্ব দিচ্ছে।

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সম্পত্তিবানদের বিরুদ্ধে ছিরু মাঝি’ গল্পটিতে আমরা দেখতে পেয়েছি ছিরু মাঝির মতো গ্রাম বাংলার আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ও বঞ্চিত অসহায় মানুষদের প্রতি নানারকম অবিচারের ছবি। আবার সাতের দশকের শুরুর দিকে রাজ্যে আসন্ন ভোট ছিরু মাঝি কাকে বা কোন চিহ্নে ভোট দেবে সেকথাও এলাকার দেবু মাস্টার একাধিকবার সরাসরি হুমকির সুরে জিজ্ঞাসা করেছে কিন্তু অসহায় ছিরু মাঝি আসলে জানেই না যে সে কোন পার্টির। এক্ষেত্রে দেবু মাস্টারের জোর করে নির্দিষ্ট কোনো দলে ভোট দেওয়ানো যেমন একদিকে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের কণ্ঠরোধ করেছে তেমনি অন্যদিকে সাতের দশকের গ্রাম্য রাজনীতিতে অবৈধ ভাবে ভোট করিয়ে কোনো একটি নির্দিষ্ট দলের ক্ষমতা



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

কায়েম রাখার কদর্য দিকটিকেও লেখক তুলে ধরেছেন।

গল্পকার সিদ্ধার্থ ঘোষের (জন্ম- ১৯৪৭) ‘দুরারোগ্য’ নামক ছোটগল্পটিতে সাতের দশকের পুলিশ-প্রশাসনের অত্যাচারের কারণে তাদের প্রতি সাধারণ মানুষের যে চরম ক্ষোভ জন্মেছিল তা লেখক গল্পের অন্যতম চরিত্র হরিহরবাবুর মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন।

হরিহরবাবু পেশায় কেরানি ছিলেন, তাঁর জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল যার পর তিনি দেশের পুলিশকে দেখতে পেলেই তাদের প্রতি তাঁর মনে ঘৃণার সঞ্চার ঘটত। তাই তিনি প্রতিদিন তার অফিস যাওয়ার সময় ট্রাফিক পুলিশদের পায়ের প্রতি লক্ষ রেখে খুঁতু ফেলতেন। হরিহর বাবুর এরূপ আচরণের জন্য তাকে শাস্তি পর্যন্ত পেতে হয়েছিল। পুলিশের তরফ থেকে তদন্ত করে জানা যায় যে হরিহরবাবুর পরিচিত এক যুবককে পুলিশ নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। তারপর থেকে পুলিশের প্রতি বিতৃষ্ণাজনিত কারণে হরিহরবাবু এরূপ কাজ করেন।

এরপর পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়ার কথা। অতএব অন্যান্য রাজবন্দীদের মতো হরিহরবাবুও মুক্তি পেয়েছিল। তাতেও কিন্তু হরিহরবাবুর পুলিশের প্রতি এতটুকুও ক্ষোভ কমেনি। আসলে সাতের দশকে পুলিশ যেভাবে সাধারণ মানুষের প্রতি নারকীয় অত্যাচার চালিয়েছিল তার ফলে সাধারণ রাজ্যবাসীর মনে পুলিশের প্রতি ঘৃণা মানসিকতা তৈরি হওয়া মোটেই অনভিপ্রেত ছিল না।

হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলা ছোটগল্পে সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষিত বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। তবে এর আগে রাজনৈতিক ঘটনা যে বাংলা ছোটগল্পে প্রভাব ফেলেনি বা কবি সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখায় সেই সময়ের ঘটনাকে তুলে ধরেননি এমন নয়। আসলে সাতের দশকের সূচনালগ্ন থেকেই দেশের এমনকি পশ্চিমবঙ্গেরও রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে উঠেছিল। কেন্দ্র সরকারকে জারি করতে হয়েছিল রাষ্ট্রপতি শাসন, জরুরি অবস্থা। এইসময় কেন্দ্র সরকারের গাইড লাইন অনুযায়ী বেশিরভাগই ‘সেন্সরে’র দৌলতে বাদ যেত, ছাপা হতো না কিছুই। তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপারে কিছু বলতে গেলেই কণ্ঠরোধ করা হত। তবে এতকিছুর বাধা-বিপত্তির গণ্ডি পেরিয়েও সাহিত্যিকরা তাঁদের সাহিত্য রচনা করেছিলেন। সেই সমস্ত সাহিত্য বিশেষ করে ছোটগল্প পাঠের মধ্য দিয়ে আমরা যেমন গণতান্ত্রিক অধিকারকে ফিরে পাবার জন্য একটা প্রতিবাদের পথ খুঁজে পেয়েছিলাম, তেমনি খুঁজে পেয়েছিলাম সেই সময়ের মানুষের জাতি-সত্তার পরিচয়ও। এইভাবে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে নানা রাজনৈতিক ঘটনাকে গল্পকারেরা তাঁদের গল্পগুলিকে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তার গুরুত্ব বাংলা সাহিত্যে অপরিসীম।

সাতের দশকের সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বাংলা শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তাই সেই সময় আমরা পেয়েছিলাম সেই প্রভাব সম্বলিত বহুবিধ সাহিত্যের সম্ভার— যেগুলিতে সময়ের দাবি অত্যন্ত জোরালো। পাশাপাশি মতাদর্শগত বিরোধ, বিভিন্ন দল-উপদল সৃষ্টি, নকশালপন্থীদের হিংসাত্মক প্রবণতা ও পুলিশের নকশাল নিধন, রাজনৈতিক স্বার্থের চরিতার্থতা, গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ, বিরোধীদের প্রতিবাদ দমন, মনুষ্যত্বের বদল ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়।

যাইহোক, সাতের দশকের অস্থির পরিস্থিতি আজ হয়তো কেটে গেছে, মানুষ ফিরে পেয়েছে তার গণতান্ত্রিক অধিকারকে, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতিকে। কিন্তু ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক ঘটনাগুলি একেবারেই স্মৃতি থেকে বিস্মৃত হয়ে যায়নি। তাই আজও নানা রঙের শাসকের নানান ধরনের আগ্রাসন আমাদের চারপাশে চোখে পড়ে— আর এটাই আমাদের ‘ট্রাডিশান’। তবু লেখার মাধ্যমেই গড়ে উঠুক শিল্পী সাহিত্যিকদের প্রতিবাদী মানসিকতা এটাই সংস্কৃতিপ্রিয় মানুষ হিসাবে আমাদের একমাত্র কাম্য।

তথ্যসূত্র

১. মিত্র, অমর, ‘ডাইন’, বিজিত ঘোষ (সম্পাদক), *নকশাল আন্দোলনের গল্প*, পুনশ্চ, কলকাতা, সংস্করণ, পৃষ্ঠা. ৪১০
২. পূর্বোক্ত, ৪১৩
৩. বর্মণ, তুষিত, ‘মুক্তি’ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩২২
৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩২৪
৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩২২
৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩২৫
৭. দাস, অরুণকুমার (সম্পা.), *গণযুগের দিনপঞ্জি* (১৯৬০-১৯৭৯), প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জুন, ২০০২, পৃষ্ঠা. ১০২
৮. বর্মণ, তুষিত, ‘মুক্তি’, বিজিত ঘোষ (সম্পাদক), *নকশাল আন্দোলনের গল্প*, পুনশ্চ, কলকাতা, পৃষ্ঠা. ৩২৭
৯. দাস, অরুণকুমার, *ষাট ও সত্তরের দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২, পৃষ্ঠা. ২৭৩
১০. দেবী, মহাশ্বেতা, ‘দ্রৌপদী’, বিজিত ঘোষ (সম্পাদক), *নকশাল আন্দোলনের গল্প*, পুনশ্চ, কলকাতা, পৃষ্ঠা. ৪৭
১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৪৮-৪৯
১২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৪
১৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৪
১৪. চক্রবর্তী, সত্যরঞ্জন, *স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গ* (১৯৫০-২০১১), শ্রীময়ী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশকাল : বইমেলা ২০১৫, পৃষ্ঠা. ১৪৪
১৫. দেবী, মহাশ্বেতা, ‘দ্রৌপদী’, বিজিত ঘোষ (সম্পাদক), *নকশাল আন্দোলনের গল্প*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৫
১৬. গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণ, ‘প্রতিক্রিয়া’, বিজিত ঘোষ (সম্পাদক), *নকশাল আন্দোলনের গল্প*, পুনশ্চ, কলকাতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৪২৩
১৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৪২৫
১৮. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, ‘পাতক’, *গল্প সমগ্র* (১ম), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ২০১০, পৃষ্ঠা. ২০৭
১৯. গুহ, রামচন্দ্র, *গাঁধী-উত্তর ভারতবর্ষ*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, (অনুবাদ—



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

আশীষ লাহিড়ী), কলকাতা, নভেম্বর, ২০১২, পৃষ্ঠা. ৪৪৩

২০. বসু, অরুণপরতন, 'গুটেনবার্গ সমস্যা', অর্ণব সাহা (সম্পাদনা), *অন্তরীপ ও অন্যান্য*, চর্যাপদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১২, পৃষ্ঠা. ১৩৫

২১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৩৫

২২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৩৬

২৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৩৭

২৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৩৭

২৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৩৮

২৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৪০

২৭. বসু, অরুণপরতন, 'আর্কিমিডিসের লাঠি', অর্ণব সাহা (সম্পা.), *অন্তরীপ ও অন্যান্য*, চর্যাপদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১২, পৃষ্ঠা. ১২০

২৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১২০-১২১

২৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১২০

৩০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১২১

৩১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১২১

৩২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১২৩

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১২৩-১২৪

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১২৪

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১২৪

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১২৬

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১২৮

৩৮. মুখোপাধ্যায়, রামকুমার, 'পেয়ারাবুড়ো পান্তাবুড়ি', *গল্পসংগ্রহ*, মিত্র ও ঘোষ, মাঘ ১৪১৯, পৃষ্ঠা. ৪৯

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫০

৪০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫১

৪১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫১

৪২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫১-৫২

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫২।

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫২

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫২।

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫২

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৩

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৩

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৪

৫০. মান্না, গুণময়, 'সহাবস্থান', *গল্পসংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০১২, পৃষ্ঠা. ১১৪

৫১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১১৬

৫২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১১৬

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১২১

৫৪. মান্না, গুণময়, 'ব্লাড প্রেসার', *গল্পসংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০১২, পৃষ্ঠা. ১২৩

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১২৪

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১২৬-১২৭